মাসিক

সরল পথ

মানব জীবনের পথ-প্রদর্শক

নিশ্চয় আল্লাহ আমার ও তোমাদের সকলেরই রব।
সুতারাং তাঁরই ইবাদত কর। এটিই সরল পথ।
- আল কুরআন ১৯ : ৩৬

৭ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা
রবিউস্ সানী-জুমাদাল উলা-১৪৪০
জানুয়ারী-২০১৯

Quba Mosque - Soudi Arabia

www.masiksaralpath.com

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

সরল পথ

রেজিঃ নং ঃ WBBEN/2012/45211

৭ম বর্ষ ঃ	৮ম সংখ্যা
রবিউস্ সানী-জুমাদিউ উলা ঃ	১৪৪০ হিজরী
পৌষ-মাঘ ঃ	১৪২৫ বাংলা
জানুয়ারী ঃ	২০১৯ ইংরেজি

সম্পাদনা পরিষদ ঃ মোহাঃ তাজাম্মুল হক সালাফী- **সম্পাদক,** আবু ফাইসাল সালমান (খোদাবখ্শ মণ্ডল), আব্দুল্লাহ্ সালাফী, আনওয়ারুল হক ফাইযী, মোহাঃ কুতুবুদ্দিন।

সার্বিক যোগাযোগ ঃ
সম্পাদক, মাসিক সরল পথ
উমরপুর হাটতলা মসজিদ (দ্বিতল)
পোঃ-ঘোড়শালা, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন ৭৪২২৩৫
মোবাইল ঃ ৯১৫৩০৪৪১৪১

মূল্য ঃ প্রতি সংখ্যা-১৮ টাকা, বাৎসরিক- ২০০ টাকা, বাৎসরিক সাধারণ ডাক যোগে - ২৩০ টাকা।

ডিষ্ট্রিবিউশন ম্যানেজার ঃ (ডাকযোগেও পত্রিকা পেতে এই নম্বরে যোগাযোগ করুন)
জিয়াউর রহমান, ৮৯২৬৭৮৭৮৯৩, ৯৮০০৫৩৪২৪৩

কম্পিউটার টাইপ সেটিং ঃ
এস.এফ. প্রিন্টার্স, মোঃ- ৯৪৩৪৫৩১৯৫৭, ৯৭৩৫৭৭১৬৮৪
Email Id : sfprintersbld@gmail.com

স্বত্ব ঃ সরল পথ এডুকেশনাল এ্যাণ্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট।

সরল পথ এডুকেশনাল এ্যাণ্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্টের পক্ষে সেখ হাবিবুল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Email Id : editorsaralpath@gmail.com
Website : www.saralpathtrust.com

★★ *প্রকাশিত প্রবন্ধের মতামত লেখকের নিজস্ব। কর্তৃপক্ষ এর জন্য দায়ী নয়।*

সূচীপত্র — **পৃষ্ঠা**

সম্পাদকীয়

মরণোত্তর পাথেয়

আশরাফুল মাখলুকাত,সৃষ্টির সেরা এবং মহান আল্লাহ্‌র মহান সৃষ্টি হল মানুষ। জন্মগতভাবে মানুষ এ উপাধিতে ভূষিত হয় না বরং শ্রবণশক্তি, দর্শনশক্তি ও বোধশক্তির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমেই তাকে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা অর্জন করতে হয়। সৃষ্টির সেরা মানুষ কেবলমাত্র ইহকালের সুখ-দুঃখ নিয়েই ভাবে না, বরং সে পরকাল জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও কষ্ট-কাঠিন্য নিয়েই গভীরভাবে ও দূরদর্শিতার সঙ্গে বিচার বিশ্লেষণ করে এবং নিজের জীবনের গতিপথ নির্ধারণ করে। সেজন্য সে নিজ সন্তানকে লুকমান হাকিমের মত আদব-কায়দা ও শিষ্টাচারের শিক্ষা দেয়। সে সম্পদ উপার্জন ও ব্যয়ের জন্য কারূন, হামান, ফেরাউনের পথ পরিহার করে সুলাইমান (আলাইহিস্ সালাম), উসমান গণী, আবূ বাকর (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) দের পথকে বেছে নেয় এবং সর্বোপরি সে নিজের অর্জিত বিদ্যা ব্যবহারের জন্য ইবলিসের পথ অনুসরণ করে না, অনুসরণ করে লুকমান হাকিম, নাবী-রসূল ও সাহাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) দের পথ। কারণ সে জানে যে, ''মৃত্যুর পর তিনটি উৎস ছাড়া মানুষের নেকির উপার্জনের সমস্ত উৎস বন্ধ হয়ে যায়। সেগুলি হল সাদকায়ে জারিয়া, উপকারী বিদ্যা এবং সুসন্তানের দুআ'' (মুসলিম ৩০৮৪)।

মরণোত্তর পাথেয়গুলির মধ্যে প্রথমটি হল সাদকায়ে জারিয়া। সাদকায়ে জারিয়ার ক্ষেত্র সংকীর্ণ নয়, ব্যাপক ও প্রশস্ত। মানুষের কল্যাণ সাধিত হয় এমন সমস্ত কথা, কর্ম ও ব্যয় সবই সাদকায়ে জারিয়া। **ভালো কথা ঃ** সব থেকে ভালো কথা হল মানুষকে আল্লাহ্‌র পথে আহ্বান করা (কুরআন ৪১/৩৩)। যদি কোনো মানুষ কারো আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইসলাম কবুল করে নেয় বা ইসলামী রীতি নীতিকে জীবনের অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করে নেয়, তাহলে সেই কথাও হবে সাদকায়ে জারিয়া। কোনো দারস বা পরামর্শের উপর ভিত্তি করে যদি কোনো জনগোষ্ঠী সেই পরামর্শ মোতাবেক ভালো কিছু করেন বা কিছু করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন সেটাও সাদকায়ে জারিয়া। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, যদি কারো পরামর্শে জনগণের কল্যাণার্থে একটি হাসপাতাল নির্মিত হয়,তাহলে যতদিন সেই হাসপাতাল থেকে মানুষের উপকার পাবে, ততদিন পরামর্শ দাতা কবরে থেকেও তার সওয়াব পেতে থাকবেন। **দ্বীনি খিদমাত ঃ** দ্বীনি খিদমাত একটি মহৎ কাজ এবং গুরুত্বপূর্ণ সাদকায়ে জারিয়া। দ্বীনি খিদমাত হল ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য সম্পদ, সময়, কায়িক শ্রম ও পরামর্শ দিয়ে অংশ গ্রহণ করা। মাসজিদ, মাদ্রাসা, মতকব, ইসলামী লাইব্রেরী স্থাপন ও পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করা। **খিদমতে খালক বা জনসেবা ঃ** খিদমতে খালক একটি গুরুত্বপূর্ণ সাদকায়ে জারিয়া। খিদমাতে খালকের ক্ষেত্রেও ব্যাপক ও বিস্তীর্ণ। বৃক্ষরোপণ, পুকুর খনন, টিউবওয়েল স্থাপন, বিশ্রামাগার স্থাপন, অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান প্রদান ইত্যাদি সবই হল সাদকায়ে জারিয়া। সম্পদ ঃ স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পদই আল্লাহ্‌র বিরাট নিয়ামত। সম্পদ মানুষের উন্নতিরও সোপান আবার অবনতিরও। সম্পদ পেয়ে মানুষ কারূন, হামান, ফেরাউনের মত পাপীও হতে পারে আবার সুলাইমান (আলাইহিস্ সালাম) ও উসমান গণী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)র মত দাতাও হতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে সম্পদ দিয়ে পরীক্ষাই করে থাকেন। সুতরাং সম্পদশালীদের সুবর্ণ সুযোগ হল এই যে, তারা ইসলামের প্রচার-প্রসার ও জনকল্যাণমূলক যে কোনো কাজে সম্পদের যথার্থ ব্যবহার করে আখেরাতের পথকে প্রশস্ত রাখবে। উপরে উল্লিখিত সমস্ত প্রকারের সাদকায়ে জারিয়ার প্রধান উৎস সম্পদকেই বলা যেতে পারে। সুপরামর্শ, সময়, কায়িক শ্রম থাকলেও সাদকায়ে জারিয়া ততক্ষণ পরিপূর্ণতা পাবে না, যতক্ষণ না প্রয়োজনীয় সম্পদ বা অর্থের সংস্থান হবে।

মরণোত্তর পাথেয়ের দ্বিতীয়টি হল উপকারী বিদ্যা। উপকারী বিদ্যা হল সেই বিদ্যা যা মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধন করে। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে জনগণের কল্যাণার্থে শিক্ষকের শিক্ষকতা, লেখকের লেখনি, বক্তার বক্তব্য, প্রকাশের প্রকাশনা সবই উপকারী বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। উপকারী বিদ্যা এমননি একটি মরণোত্তর পাথেয় যার ধারা উপধারা শাখা প্রশাখা ক্রমাগত বিস্তৃত হতেই থাকে। কখনো থেমে যায় না। শিক্ষকের ছাত্র সংখ্যা, লেখকের পাঠক সংখ্যা, বক্তার ভাবধারার অনুসারীর সংখ্যা এবং প্রকাশকের মুদ্রিত কপির সংখ্যা যতই বাড়তে থাকবে, ততই বাড়তেই থাকবে তাঁদের নেকির সংখ্যা ও পরিমাণ।

মরণোত্তর পাথেয়ের তৃতীয়টি হল সুসন্তানের দুআ। সুসন্তানেই পিতামাতার যোগ্য উত্তরাধিকারী। সে জানে পিতামাতার হক আদায় করতে, জানে ইজ্জত, সম্মান ও পরিষেবা দিতে, জানে তাদের সঙ্গে বিনয়ের সঙ্গে কথা বলতে। পিতামাতার মৃত্যুতে সব থেকে বেশি ব্যথিত হয় সন্তান। তাই সন্তানই তাঁদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকটে সব থেকে বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করবে এটাই স্বাভাবিক। সেজন্য সুসন্তান সর্বদা পিতামাতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে এবং তাঁদের জন্য দান খয়রাতও করতে থাকে।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে আমাদের সম্পদ, সন্তান ও শিক্ষাকে উপকারী ও মরণোত্তর পাথেয় হিসাবে ব্যবহার করার তওফীক দাও — আমীন।

দারসে ক্বুরআন (ক্বুরআনের পাঠ)

সংস্কৃতির নামে অপসংস্কৃতি

আব্দুল্লাহ্ সালাফী

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَائَهُمْ بَعْدَ الَّذِىْ جَائَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍo اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ o

ইহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায় আপনার প্রতি কখনই সন্তুষ্ট হবেনা যতক্ষণ না আপনি তাদের রীতি-নীতির অনুসরণ না করছেন। আপনি বলে দিন, নিশ্চয় আল্লাহ্র নীতি ও আদর্শই হচ্ছে একমাত্র হিদায়াত (ও পন্থা)। যদি আপনি তাদের প্রবৃত্তির (চাহিদা কামনার) অনুসরণ করে (প্রকৃত) জ্ঞান আপনার নিকট আগমনের পরেও (তাহলে মনে রাখবেন) আল্লাহ্র (রোষানল হতে) রক্ষা করার জন্য কোনো পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী নেই। যাদের আমি গ্রন্থ (আল্ কুরআন) দিয়েছি তারা তাকে যথার্থরূপে অধ্যয়ন করে (এবং তার) প্রতি বিশ্বাস বা ঈমান রাখে। আর যারা তাকে অমান্য করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত (সূরাতুল বাক্বারাহ্/১২০-১২১)।

মহান আল্লাহ্ উক্ত আয়াত দ্বারা নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) সহ তাঁর উম্মাতকে সতর্ক করেছেন যে, ইহুদী ও নাসারা এবং তাদের দোসরগণ উম্মাতে মুসলিমাহ্র প্রতি তখনই সন্তুষ্ট হবে, যখন তাদের নীতি ও আদর্শের অনুসরণ করা হবে। আল্ কুরআনের সূরাহ্ মুমতাহানার ২য় আয়াতে ইসলাম বিরোধী লবি; আকাংখা ও চাহিদার কথা ব্যক্ত করেছেন, ''তারা চাই যে, তোমরা তাদের মত কাফির হয়ে যাও।'' তবে আল্লাহ্ আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে স্পষ্ট করে দিয়েছেন আল্লাহ্র নীতি ও আদর্শই হচ্ছে একমাত্র মুক্তির পথ। এই আদর্শ মানুষের নিকট পৌঁছে যাওয়ার পরেও যদি কেউ তাদের প্রবৃত্তির কেউ অনুসরণ করে তাহলে আল্লাহ্ কর্তৃক শাস্তি প্রদানের সময় কেউ তা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রাখেনা।

প্রকৃত মুমিন তারাই যারা আল্ কুরআনকে প্রকৃত অর্থে পড়ে ও তার ভাব জগতে নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং তাতে যা বর্ণিত হয়েছে তা হৃদয়াঙ্গম করতঃ তার প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করে। কেউ যদি তাতে বর্ণিত আদর্শসমূহের বিধিনিষেধকে অস্বীকার ও অমান্য করে তা হলে সে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে অবশ্যই সাময়িক ক্ষতির শিকার হবে। মহান আল্লাহ্ বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার বিধান (আল্ কুরআন)কে উপেক্ষা করবে তার জীবন জীবিকা দুর্বিসহ সহ হবে এবং তাকে আমি পরকালীন দিবসে অন্ধকারে উপস্থিত করব।' সে বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক তুমি আমাকে চক্ষুহীনরূপে কেন উপস্থাপন করেছ, আমি তো চক্ষুস্মান ছিলাম?' তিনি বলবেন, 'ঠিক এ কারণেই যে তোমার নিকট আমার বিধান পৌঁছেছিল, তখন তুমি তা উপেক্ষা করেছিলে, তাই আজ তোমায় ভুলে যাওয়া হয়েছে' (সূরাহ্ ত্ব-হা ১২৪-১২৬)।

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ও তাঁর সাথীগণ হচ্ছেন কিয়ামাত অবধি আগত সমস্ত মানবমণ্ডলীর জন্য উত্তম আদর্শের অধিকারী ব্যক্তিত্ব। তাঁদের ঈমান ও আমলকে আল্লাহ্ হিদায়াত প্রাপ্তির জন্য মাপকাঠি হিসাবে তুলে ধরেছেন। এদের ব্যতিক্রমী ঈমান দ্বন্দ্ব ও সমস্যার আঁতুড়ঘর হিসাবে আল্ কুরআনে ঘোষিত (সূরাহ্ বাকারাহ্/১৩৭)।

ইমাম মালিক (রহ্মাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন —

وَمَنْ أَحْدَثَ فِى هَذِهِ الْأُمَّةِ شَيْئًا، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَلَفُهَا فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَانَ الدِّيْنَ لِاَنَّ اللهَ يَقُوْلُ (أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ) المائده، فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِيْنًا لَا يَكُوْنُ الْيَوْمَ دِيْنًا.

কেউ যদি এই উম্মাহ্র মধ্যে নতুন কিছু করে, যা সালাফ (সাহাবীগণের) মধ্যে ছিলনা, তাহলে সে এই বিশ্বাসেই করে যে রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) খিয়ানাত করেছেন। (তিনি সম্পূর্ণ দ্বীন মানুষের নিকট পৌঁছান নি) অথচ আল্লাহ্ বলেন, 'আমি দ্বীনকে তোমাদের জন্য পূর্ণরূপে প্রদান করেছি' (সূরাতুল মায়েদাহ্/৩)। যা কিছু সেকালে দ্বীন হিসাবে ছিলনা, তা এ সময়েও দ্বীন হতে পারেনা (আন্ নাকফু ওয়াল বায়ানু ফী দাফ্ঈ আওহামি খুযায়বান ১ম খণ্ড ২০৮ পৃঃ)।

তাঁর হতে একথাও নকল করা হয়েছে যে —

لا يصلح آخر هذه الأمة الا بما صلح اولها فما لم يكن

يومئذ دينًا لا يكون اليوم دينا.

এই উম্মাতের শেষের লোকেরা ভালো হতে পারে পূর্বের লোকেরা (সাহাবীগণ) যদ্বারা ভালো হয়েছিলেন তা অনুসরণ করে। সে সময়ে যে দ্বীনরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল না, তা বর্তমানে দ্বীন হতে পারে না (হাজ্জাতুন নাবী, লিল আলবানী রহঃ ১ম খণ্ড ১০৩ পৃঃ)।

বর্তমানে মুসলিম উম্মাহ্ স্বীয় ঐতিহ্য, গৌরবজ্জ্বল সভ্যতা এবং ঐশী দিক নির্দেশনা যা ত্রুটিমুক্ত ও সমগ্র মানবতার জন্য আপাদমস্তক কল্যাণের জামিন, তা ভুলে বসেছে। 'চক চক করলেই সোনা হয় না' কথাটি ভুলে গেছে। সাময়িক উত্তেজক ও যৌন উদ্দীপক কালচার যার পরিণতি ইহকাল ও পরকালের জন্য অতীব বিষময়, তাকে বরণ করতে গিয়ে নিজেদের স্বকীয়তাকে বিসর্জন দিয়েছে। আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) স্বীয় জন্ম দিবস, মাস না নিজে পালন করেছেন, না করতে বলেছেন, না সাহাবীগণ তাঁদের জীবনকালে কোনো দিন পালন করেছেন। অথচ তথাকথিত মুসলিমগণ তা পালন করতে গিয়ে অপসংস্কৃতি ও শয়তানের প্রিয় বিষয় অপচয়ের শিকার হচ্ছেন। নাবী দিবস পালন করাটা তাদের নিকট নাবী প্রেম ও নাবী ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ। এমন মাজলিস সমূহে আহ্‌লে হাদীস নেতৃবৃন্দের অংশগ্রহণ বিষয়টিকে আরও জটিল করে তুলেছে। একে বৈধতা প্রদানের জন্য অপকৌশল ছাড়া কি হতে পারে।

হিজরী নববর্ষ পালন করা হারাম না হালাল এই মর্মে এক প্রশ্নের উত্তরে ফাতাওয়া শাবাকাহ্ ইসলামিয়্যাহ্-এর পক্ষ হতে যে উত্তর প্রদান করা হয়েছে তা, হিজরী নববর্ষ পালনও সেদিন উৎসব পালনের কোনো ভিত্তি শরীআতে নেই। কোনো সাহাবী, তাবেয়ী হতে এটা পালনের কোনো প্রমাণ নেই। এটা করা উত্তম অথবা তা করা বৈধ বলে কোনো ইমাম হতে বর্ণিত হয়নি। মুসলিমদের নিকট দুটি মাত্র ঈদ। ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিত্‌র। যেমনটি সহীহ্ হাদীসে এসেছে (অষ্টম খণ্ড ৬৯৭ পৃঃ)। যদি হিজরী সন সম্পর্কে এমনটি বলা হয়, তাহলে ইংরেজি, বাংলা, হিন্দী ও অন্যান্য বর্ষ পালন কি করে অবৈধ হতে পারে? বাংলা অথবা ইংরেজি নববর্ষকে কেন্দ্র করে যত রকম অশ্লীলতার আমদানী হয় এবং যে হারে নিষিদ্ধ বাজি ও বাদ্যযন্ত্রের দাপটে নাগরিক সমাজ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। দেশীয় আদালত এসবকে অবৈধ ঘোষণা না করলেও শব্দের একটি উচ্চসীমা নির্দ্ধারন করেছেন। বৃদ্ধ-শিশু, অসহায় মানুষগুলি ওই দিনগুলিতে কত যে অসহায়ত্ব বোধ করেন, তা ভাষায় প্রকাশ করে বোঝা যাবে না। ইসলামের নামে এরা কলঙ্ক। কারও জন্ম দিনকে কেন্দ্র করে কোনো উৎসব অনুরূপভাবে নিষিদ্ধ। যিশু খৃষ্টের জন্ম দিন ২৫শে ডিসেম্বরকে বড়দিন হিসাবে দেখা হয়, যা সরাসরি কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের সাথে সংঘর্ষশীল। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) হচ্ছেন নাবীকূল শিরোমণি। যখন তাঁর আগমন হেতু উৎসব নিষিদ্ধ হয় তাহলে ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) বা যীশুর জন্মকে কেন্দ্র করে পুরো ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসদ্বয় উৎসব মুখর কেন থাকে।' বনভোজন, সাময়িক ভোজন, ফিস্ট, তার সাথে অশ্লীল গানের ক্যাসেট ও বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার বেড়ে যায়। বাজারসমূহে কেনা কাটার রমরমা, জন্মদিনের কেক কেনা ও কাটার বিশেষ আয়োজন হয়ে থাকে ক্রিসমাস ডের নামে। এসব বিজাতীয় অনুকরণ। জানিনা, যারা ইসলামী রীতি-নীতিতে সন্তুষ্ট নয় তাদের ইসলামের কী হবে? বিনা দলীলে দাবির ভিত্তিতে যদি জমির মালিক না হওয়া যায়, তাহলে ইসলামের মত দলীল ভিত্তিক জীবনাদর্শ বিনা দলীলে কীভাবে গৃহীত হবে? ডিসেম্বর ও জানুয়ারী কেন্দ্রিক যাবতীয় ভোজনের আয়োজন যেহেতু ক্রিসমাস ডের সম্মানে এদেশে ইংরেজ তোষণের জন্য চালু হয়েছিল সেজন্য তাদের প্রবৃত্তির অনুসারীদের জন্যই নাবীর মাধ্যমে উম্মাহ্‌কে আল্লাহ্ বলে দিয়েছেন, এদের শাস্তি অবধারিত এবং তা প্রয়োগকালীন তাতে বাধা প্রদানকারী কেউ নেই।

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''কেউ যদি অন্য জাতির সাদৃশ্য বহন করে তাহলে সে তাদের সদস্য রূপে গণ্য হবে। সুনানু (আবূ দাউদ ৪০৩১) তিরমিযীর অপর হাদীসে রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, 'যে অন্যের সাদৃশ্য বহন করল সে আমাদের লোক নয়' (সুনানুত্ তিরমিযী ২৬৯৫)।

প্রতিটি মুসলিম গ্রামে উচ্ছৃঙ্খল দ্বীন বিমুখ যুবকের দল বিজাতীয় সংস্কৃতিতে বেশি আনন্দ উপভোগ করে মোবাইল, ল্যাপটপ ও অন্যান্য মেমোরীতে শুধু অশ্লীলতা ও আবীলতা পূর্ণ হয়ে আছে। সাংস্কৃতিক প্রোগ্রামের নামে অপসংস্কৃতির দ্বারা এলাকাকে বিষাক্ত করে চলেছে। দুঃস্থ-দরিদ্রদের শীত বস্ত্র দান ও সহযোগিতার নামে চলছে বেলেল্লাপনার আমদানী। সমাজের তথাকথিত আলিম ও সমাজপতিদের মনের বিষ মনে মারছে অথবা না দেখার ভান করে এসব কিছুকে প্রচ্ছন্নভাবে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে। শব্দ দূষণে পরিবেশ বান্ধব পাখি ও প্রাণীকূলের প্রজন্ম সংকটের মুখে। হার্ট অ্যাটাক, হঠাৎ মৃত্যু এরই কুফল। স্মৃতি শক্তির দুর্বলতা, কানা এবং মাথার অসুখ শব্দ দূষণের জের। সাময়িক খুশি বা

পরবর্তী অংশ ১৬ পৃষ্ঠায়

দারসে হাদীস (হাদীসের পাঠ)

মানুষ ও তার বাসনা

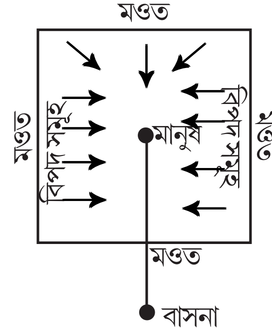
আতাউর রহমান সালাফী

عَـنْ عَبْـدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : خَطَّ النَّبِىُّ ﷺ خَطًّا مُـرَبَّعًا وَ خَطَّ خَطًّا فِى الْوَسْطِ خَارِجًا مِّنْهُ وَ خَطَّ خُطَطًا صِغَـارًا اِلٰـى هٰـذَا الَّـذِىْ فِى الْوَسْطِ مِنْ جَانِبِهِ الَّذِىْ فِىْ الْـوَسْـطِ وَ قَالَ هٰذَا الْاِنْسَانُ وَ هٰذَا اَجَلُـهٗ مُحِيْطٌ بِهٖ اَوْ قَدْ اَحَـاطَ بِـهٖ . وَ هٰـذَا الَّذِىْ هُوَ خَارِجٌ أَمَلُـهٗ وَ هٰذِهِ الْخُطَطُ الـصِّـغَـارُ اَلْاَعْـرَاضُ، فَـاِنْ أَخْطَأَهٗ هٰذَا نَهَشَهٗ هٰذَا. وَاِنْ أَخْطَأَهٗ هٰذَا نَهَشَهٗ هٰذَا.

আব্দুল্লাহ্ (ইবনু মাসউদ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘‘রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) একদা রেখা টেনে বর্গাকার অংকন করেন। অতঃপর মধ্যখান থেকে আরো একটি রেখা বাহির পর্যন্ত অংকন করেন। এছাড়াও মধ্যরেখাগামী তার চারপাশে ছোট ছোট বহু রেখা অংকন করেন। অতঃপর বলেন, এ মধ্যবিন্দু হল মানুষ। বাহির পর্যন্ত এ দীর্ঘ রেখার প্রান্ত হল তার বাসনা। আর এ ছোট ছোট রেখাগুলি হল তার বিপদ। যদি এ একটি বিপদ ভুল করে দেয় তবে অপর আরেকটি তাকে কামড়ে ধরবে। যদি অপরটি ভুল করে দেয় তবে এ আরেকটি তাকে দংশন করবে (বুখারী, অধ্যায় বাসনা ও তার দৈর্ঘ্যের বর্ণনা, হাদীস নং ৬৪১৭, নাসায়ী - কিতাবুর রাকাইক, হাদীস নং ১১৭৬৪, সামান্য শব্দের হেরফেরে হাদীসটি ইবনু মাজাহ্ ও তিরমিযীতেও বর্ণিত হয়েছে)।

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) হলেন মানব হিতৈষী। তাঁর মূল মিশন ছিল মানবতার কল্যাণ। মানব জাতিকে অন্ধকার হতে বের করে আলোর পথ দেখাতে নিরলস ও নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। স্বীয় মিশন সফল করার লক্ষ্যে তিনি ছিলেন সদা প্রস্তুত। তাঁর মিশনের মূল লক্ষ্য হল বিচার দিবসের সফলতা। সে দিন যেন মানুষ বিফল ও ব্যর্থ না হয় তার জন্য মানব জাতিকে তিনি করেছেন বিভিন্নভাবে সচেতন। কখনো উপমা, কখনো আদেশ, কখনো নিষেধ, কখনো উপহারের সংবাদ দিয়ে এর প্রতি করেছেন অনুপ্রাণিত। আবার কখনো ভয়ানক পরিণতির অবগতির দ্বারা ভীতির মাধ্যমেও করেছেন উদ্বুদ্ধ। বিচার দিবসে মানুষ যেন ব্যর্থ না হয় তার প্রস্তুতিস্বরূপ মানুষের গতিবিধি কীরূপ হওয়া উচিৎ সে বিষয়ে এক উপমা হল এ বক্ষমান হাদীস।

নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এ হাদীসে মানুষ, তার বাসনা, তার সংকট ও আয়ু বোঝানোর জন্য রেখার মাধ্যমে উপমা তুলে ধরেন। সম্ভবত রেখাঙ্কিত চিত্র এরূপ হবে—



সমান মাপের রেখা দ্বারা একটি বর্গাকার অংকন করেন। অতঃপর বর্গাকারের মধ্যখানে একটি রেখা অংকন করে সেটিকে বর্গাকারের বেষ্টনী রেখা অতিক্রম করে বের করে দেন। অতঃপর মধ্যখানে অংকন করা রেখার চারপাশে ছোট ছোটো তার অভিমুখে অনেকগুলি দাগ কেটে দেন। এরপর এ উপমার অর্থ সাহাবীদের বুঝিয়ে দেন। মধ্যবিন্দু হল মানুষ। বর্গাকারের বেষ্টনী রেখা হল মানুষের মওত। মধ্যবিন্দু থেকে বর্গাকারের বেষ্টনী রেখা অতিক্রম করে বাইরে বেরিয়ে যাওয়া রেখার শেষপ্রান্ত হল মানুষের বাসনা। মধ্যখানে অঙ্কিত বিন্দুর দিকে এগিয়ে আসা রেখাগুলি মানুষের বিপদ, সংকট ও বালা মুসীবাত। যদি কোনো একটি বিপদ থেকে মানুষ রক্ষা পেয়ে যায় অপর বিপদ তাকে কামড়ে ধরবে। পুনরায় যদি অপর বিপদ থেকেও রক্ষা পেয়ে যায় ধেয়ে আসবে আরেক বিপদ।

এর দ্বারা রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) মানুষকে যে শিক্ষা দিয়েছেন তা হল —

মানুষের আয়ু সীমিত, কিন্তু তার বাসনা আয়ু থেকে দীর্ঘ। যেহেতু মানুষের বাসনা আয়ু থেকে দীর্ঘমেয়াদী তাই সে স্বল্প ও সীমিত মেয়াদী মওতকে ভুলে থাকবে। মানুষের জীবন হাজারো বিপদে মোড়া। তাই তার জীবদ্দশায় বহু বিপদ আসবে এটিই স্বাভাবিক। এ সকল বিপদ তাকে দাঁত দিয়ে ধরার ন্যায় কামড়ে ধরবে। করবে জর্জরিত। যদি একটি থেকে রেহাই পেয়ে যায় অপর বিপদ করবে অপেক্ষা। মারবে ছোবল। উগরে দেবে

বিষথলি।

এ সকল বিপদ হল তার মরণ স্মরণিকা, কিন্তু না, দূরে অবস্থিত বাসনা তাকে হাতছানি দ্বারা করবে প্রলুব্ধ। হারিয়ে দেবে মরণের স্মরণ। এভাবে চলতে চলতে কখন যেন জীবন মেয়াদ হবে শেষ। হাজির হবে মওত। এর থেকে রেহাইয়ের নেই কোনো উপায়। কেননা চারিদিকেই মওত। সে আবদ্ধ। প্রস্তুত না থাকলেও, মন না চাইলেও যবণিকা টেনে দিতেই হবে সঙ্গ। অধরা থেকেই যাবে বাসনা।

নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর মাধ্যমে শুধু পরিস্থিতি বোঝাতে চাননি। তিনি মানুষকে করেছেন সচেতন। জীবনের লক্ষ্য ও বাসনা কোনো দিনই হবে না পূরণ। কাজেই বাসনার হাতছানিকে উপেক্ষা করে তার পূর্বে এসে হাজির হওয়া মরণকে স্মরণের জন্য জুগিয়েছেন জীবন্ত অনুপ্রেরণা। উপহার দিয়েছেন এ নীতি যে, বাসনা যদি বৈধ হয় তবুও সর্বদা মরণকে স্মরণ রেখে করতে হবে। হতে হবে ছোটো স্বল্পমেয়াদী। যাতে তা শীঘ্র পূর্ণতা পায় ও পরকালের জন্য হয় ফলপ্রসূ। প্রকাশ থাকে যে অবৈধ বাসনা ছোটো হোক বা বড়ো; স্বল্প মেয়াদী হোক বা দীর্ঘ মেয়াদী কোনোটাই কোনো সময়েই মুমিন কর্তৃক কাঙ্খিত নয়।

দ্বীনের স্বার্থে প্রাসঙ্গিক দীর্ঘ বাসনা অবশ্য প্রশংসনীয়। যদি বাসনাকারী নিজে তা পূর্ণতা দিতে না পারে আল্লাহ্ প্রতিনিধি নিযুক্ত করে তাকে পূর্ণতা দিতে পারেন। আর সাদকায়ে জারিয়া হিসাবে তার প্রতিদান বাসনাকারী ভোগ করবে। যদি প্রাসঙ্গিক দীর্ঘ বাসনা পূর্ণতা নাও পায় কিংবা শুরু নাও করা হয় তবুও বাসনাকারী এক গুণ প্রতিদান পাবে (বুখারী, অধ্যায় - যে ব্যক্তি মঙ্গল অথবা অমঙ্গলের ইচ্ছা করে, হাদীস নং ৬৪১১)।

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, ''আমি জ্বিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার উপাসনার জন্য'' (সূরাহ্ যারিয়াত ৫১/৫৬)। এ পৃথিবী হল উপাসনাস্থল ও পার্থিব জীবন হল উপাসনা সম্পাদনের মেয়াদকাল। এ সময় ও স্থানে উদ্দেশ্য বহির্ভূত হয়ে সঙ্গ দেবে না এমন বস্তুর পিছনে ধাওয়া করা বুদ্ধিমান লোকের পরিচয় নয়।

জীবন মেয়াদের যথাযথ মূল্যায়ণ করা আমাদের উচিৎ। এ জীবন আমাদের জন্য একবারই জুটেছে। এ নয় যে, এবার যা হলো, পরের বার যথাযথ মূল্যায়ণ করবো।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ এ দুনিয়ার বাস্তব চিত্র বহু আয়াতে বিভিন্নভাবে তুলে ধরেছেন, তার মধ্যে কয়েকটির অনুবাদ নিম্নরূপ ঃ—

(১) পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক মাত্র। যারা সাবধানতা অবলম্বন করে তাদের জন্য পরকালের আবাসই উত্তম, তোমরা কি জ্ঞান-বিবেক করবেনা? (সূরা আনআম ৬/৩২)।

(২) অতএব তাদের ধনসম্পদ এবং সন্তানাদি যেন তোমাকে পছন্দ না লাগে। আল্লাহ্ তাদেরকে এ সবের মাধ্যমে পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চান এবং তাদের প্রাণ কাফের অবস্থায় দেহত্যাগ করবে (সূরাহ্ তাওবাহ ৯/৫৫)।

(৩) পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত আকাশ হতে বর্ষিত বৃষ্টির মতো। যার দ্বারা ভূপৃষ্ঠের উদ্ভিদ ঘন হয়ে উৎপন্ন হয়। এর থেকে মানুষ ও পশু ভক্ষণ করে। এরপর ভূমি যখন সুশোভিত হয় এবং তার মালিকরা মনে করে যে এখন তারা তার পূর্ণ অধিকারী। তখন দিনে অথবা রাতে তার উপর আমার আযাব দিয়ে তা এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিই যেন গতকাল তার অস্তিত্বই ছিলনা। এরূপেই আমি চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য বিশদরূপে নির্দেশাবলী বর্ণনা করে থাকি (সূরাহ্ ইউনুস ১০/২৪)।

পৃথিবীর মূলয়্যান সংক্রান্ত আরো কিছু আয়াতের উদ্ধৃতি ঃ— সূরা কাহাফ ১৮/৪৫, সূরা ত্বহা ২০/১৩১, সূরা আনকাবুত ২৯/৬৪, সূরা মুমিন ৪০/৩৯, সূরা হাদীদ ৫৭/২০। উক্ত আয়াতগুলি পাঠকবর্গকে অনুধাবন করার জন্য অনুরোধ জানাই।

আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আমার কাঁধ ধরে বলেন, ''দুনিয়ায় তুমি প্রবাসী অথবা পথ অতিক্রমকারী ব্যক্তির ন্যায় থাকো।'' ইবনু উমার বলতেন, ''তুমি যখন সন্ধ্যায় পৌঁছাবে সকালের অপেক্ষা করো না, যখন তুমি সকালে পৌঁছাবে সন্ধ্যার অপেক্ষা করো না'' (বুখারী ৬৪১৬)।

এ দার্সের হাদীসের বুখারীর অধ্যায়ে সনদবিহীনভাবে বর্ণিত — আলী ইবনু আবী তালিবের উক্তি দ্বারা ইতি টানতে চাইছি — ''দুনিয়া পিছিয়ে চলেছে, আখেরাত এগিয়ে আসছে। এ দুয়েরই সন্ধানী রয়েছে। তোমরা আখেরাত সন্ধানী হও। দুনিয়া সন্ধানী হয়ো না। পৃথিবীর এ সময়কাল আমলের, হিসাবের নয়। আগামীকাল (পরকাল) হিসাবের আমলের নয়'' (বুখারী)।

আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা , হে আল্লাহ্ তুমি আমাদের সঠিক জ্ঞান দান করো ও জীবনের মূল্যায়ন করার ক্ষমতা দাও — আমীন।

৪৯ পর্ব

بَابُ شُرُوْطِ الصَّلاَةِ (١)

স্বলাতের শর্তাবলীর বিবরণ

ভাষান্তর ঃ তাজাম্মুল হক সালাফী

১৬৫ ঃ স্বাধীন নারী এবং দাসীর সতর বা লজ্জাস্থান

স্বাধীন নারীর নিজের মুখমণ্ডল এবং হাত ব্যতীত সমস্ত শরীরই হল লজ্জাস্থান এবং দাসীর মুখমণ্ডল ব্যতীত সমস্ত শরীর লজ্জাস্থান (স্বাধীন ও দাসীর মধ্যে পার্থক্য নির্ধরাণ করার জন্য) আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

(ক) আল্লাহ্ বলেন — وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا (النور - ٣١)

নারীরা নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না, তবে যে অঙ্গ নিজে থেকে প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এই আয়াতের তাফসীরে বলেন — 'যে অঙ্গ নিজে থেকে প্রকাশ হয়ে পড়বে' বলতে মুখমণ্ডল ও হাতকে বোঝানো হয়েছে।[১]

ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)ও একই তাফসীর করেছেন।[২]

(খ) এই আয়াতের শেষে রয়েছে ঃ

وَ لَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ (النور - ٣١)

নারীরা নিজেদের পদযুগলকে এমনভাবে যেন সঞ্চালন না করে যে, তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ হয়ে পড়ে (সূরাহ্ নূর/৩১)।

(ইবনু হাযম রহঃ) নারীদের পা এবং পায়ের নলা লজ্জাস্থানের অন্তর্ভুক্ত এই আয়াত তার দলীল।[৩]

(গ) ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন اَلْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ নারীর সম্পূর্ণ দেহই লজ্জাস্থান।[৪]

দাসীর সতর বা লজ্জাস্থানের বিষয়ে ওলামাদের মত পার্থক্য রয়েছে ঃ

(আহ্লে যাহীর) ঃ স্বাধীন নারী ও দাসীর লজ্জাস্থানের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই (কেননা হাদীসে حائض বা বয়ঃপ্রাপ্ত শব্দটি সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে)।

(জমহুর, শাফেয়ী, আবূ হানীফা রহঃ) এ দুজনের লজ্জাস্থানের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। দাসীর লজ্জাস্থান পুরুষের মত নাভী এবং হাঁটুর মধ্যবর্তী স্থান।[৫]

১। ইবনু আবী শাইবা ৪/৯৭৩।
২। তামামুল মিন্নাহ্ পৃঃ ১৬০।
৩। আল্ মুহাল্লা ৩/২৪৩।
৪। সহীহ্ ঃ আল্ মিশকাত ৩১০৯, তিরমিযী ১০৯৩, কিতাবুর রাযা ঃ বাবু মা জাআ ফী কারাহিয়াতিদ্ দুখুল আলাল মুগাই ইয়েবাত।
৫। নাইলুল আওতার ১/৫৩৮, আলউম্ম ১/১৮৩, ফাত্হুল অহ্হাব ১/১৪৯, আল হাবী ২/১৬৭, শারহু ফাত্হুল কাদীর ১/২২৫, তুহ্ফাতুল ফুকাহা ১/২৫০, আল কাফী পৃঃ ৬৩।

তাদের দলীল ঃ আমর বিন শুয়ায়েব আন আবীহি আন জাদ্দিহি থেকে বর্ণিত আছে যে, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন — اِذَا زَوَّجَ اَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ فَلَا يَنْظُرَنَّ اِلٰى عَوْرَتِهَا.

তোমাদের মধ্যে কেউ যখন নিজের দাসের বিবাহ নিজের দাসীর সঙ্গে দেবে, তখন সে যেন সেই দাসীর সতর বা লজ্জাস্থান না দেখে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে — فَلَا يَنْظُرَنَّ اِلٰى مَا دُوْنَ السُّرَّةِ وَ الرُّكْبَةِ

সে যেন দাসীর নাভীর নীচে এবং হাঁটুর উপরে না দেখে[১] (মনে রাখতে হবে যে, এ হাদীসে কেবল মালিকের জন্য বিবাহিতা দাসীর লজ্জাস্থানের বিবরণ রয়েছে সকলের জন্য এ সতর বা লজ্জাস্থান নয়)।

রাজেহ ঃ প্রথমে যে মতবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে সেই মতবাদটিই বেশি সঠিক।

১৬৬ ঃ স্বলাতে লজ্জাস্থান আবৃত করা ব্যতীত পুরুষের জন্য কতটা কাপড় ব্যবহার করা জরুরী?

পুরুষ মুসাল্লীকে সতর আবৃত করা ছাড়াও কাঁধে কাপড় রাখা জরুরী। তবে হ্যাঁ যদি কাপড় না থাকে (তাহলে স্বতন্ত্র বিষয়)।

(ক) আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন —

لَا يُصَلِّيَنَّ اَحَدُكُمْ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلٰى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْئٌ.

তোমাদের মধ্যে কেউ যেন এমন এক কাপড়ে স্বলাত না আদায় করে যার কোনো অংশ ঘাড়ের উপর থাকে না।[২]

(খ) অন্য একটি রেওয়ায়াতে আছে — مَنْ صَلّٰى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ.

যে ব্যক্তি একটি কাপড়ে স্বলাত পড়বে, তাকে কাপড়ের দুটি প্রান্তকে বিপরীত দিকে ঘাড়ের উপর রাখা উচিত।[৩]

যদি কাপড় ছোট হয়, তাহলে কেবল লুঙ্গি হিসাবে পরিধান করে লজ্জাস্থান আবৃত করা সর্বাবস্থায় জরুরী। যেমন জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেনঃ اِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ. যদি কাপড় কম হয়, তাহলে তাহবন্দ বা লুঙ্গি হিসাবে পরিধান কর।[৪]

১৬৭ ঃ স্বলাতে মহিলাদের পোষাক কতটা হওয়া উচিত?

সতর অর্থাৎ মুখমণ্ডল এবং হাত ব্যতীত সমস্ত শরীর আবৃত রাখা উচিত।

(ক) خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ (الاعراف . ٥)

''অর্থাৎ প্রত্যেক স্বলাতের সময় সৌন্দর্য ধারণ কর অর্থাৎ পোশাক পরিধান কর'' (সূরা আল্ আরাফ ঃ ৫) — এই অনির্দিষ্ট হুকুমের মধ্যে নারীরাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

১। হাসান ঃ আল্ মিশকাত ৩১১১, আবূ দাউদ ৪১৮, কিতাবুস স্বলাত ঃ বাবু মাতা ইউমারুল গুলাম বিস্ স্বলাত।

২। বুখারী ৩৫৯, ৩৬০, কিতাবুস স্বলাত ঃ বাবু ইযা স্বল্লা ফিস সওবিল ওয়াহেদে ফালইয়াজআল আলা আতেকাইহি, মুসলিম ৫১৬, আবূ দাউদ ৬২৬, আহমাদ ২/২৪৩, নাসায়ী ২/৭১।

৩। বুখারী ৩৬০, প্রাগুক্ত, আবূ দাউদ ৬২৭, আহমাদ ২/২৫৫, শারহু মাআনিল আসার ১/৩৮১, ইবনু হিব্বান ২৩০৪, শারহুস সুন্নাহ্ ৫১৭।

৪। বুখারী ৩৬১, কিতাবুস্ স্বলাত ঃ বাবু ইযা কানাস্ সওব যাইএকা মুসলিম ৩০১০, ইবনু খুযাইমা ৭৬৭, বাইহাক্বী ২/২৩৮, ইবনু হিব্বান ২৩০৫, আহমাদ ৩/৩৩৫।

(খ) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন ঃ

لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلَاةَ حَائِضٍ اِلَّا بِخِمَارٍ.

বয়ঃপ্রাপ্ত মহিলার স্বলাত ওড়না ব্যতীত আল্লাহ্ তাআলা কবুল করেন না।[১]

যে সমস্ত বর্ণনায় রয়েছে যে, মহিলাদের জন্য তিনটি বা দুটি কাপড় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যেমন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন ঃ

تُصَلِّى الْمَرْأَةُ فِىْ ثَلَاثَةِ اَثْوَابٍ : دِرْعٌ وَ خِمَارٌ وَ اِزَارٌ.

মহিলা তিনটি কাপড়ে স্বলাত সম্পাদন করবে কামীস, ওড়না এবং শালওয়ার।[২]

মাইমুনাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে,

اِنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّى فِى الدِّرْعِ وَ الْخِمَارِ لَيْسَ عَلَيْهَا اِزَارٌ.

তিনি কামীস ও ওড়নাতেই স্বলাত আদায় করতেন কিন্তু ইযার বা তহবন্দ ব্যবহার করতেন না।[৩]

উল্লিখিত বর্ণনাগুলি থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিন কাপড় ব্যবহার করা মুস্তাহাব ও উত্তম[৪]। কেননা যদি সতর বা লজ্জাস্থান আবৃত থাকে, তাহলে একটি কাপড়েও স্বলাত হয়ে যাবে।[৫] যেমন আবূ হুরাইরা কর্তৃক বর্ণিত সহীহ্ হাদীস এর দলীল।[৬]

মজবুত ভাবে চাদর যেন না পরে ❶ এবং ঝুলিয়ে না রাখে❷	**وَ لَا يَشْتَمِلُ الصَّمَّاءَ وَ لَا يَسْدِلُ**

❶ আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে,

نَهَى النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يَّشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ.

তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) মজবুতভাবে চাদর গায়ে দিতে নিষেধ করেছেন।[৭]

অন্য একটি রেওয়ায়াতে রয়েছে ঃ

نَهَى النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يَّشْتَمِلَ فِىْ اِزَارِهِ اِذَا مَا صَلَّى اِلَّا اَنْ يُخَالِفَ بِطَرَفَيْهِ عَلٰى عَاتِقَيْهِ.

১। সহীহ্ ঃ সহীহ্ আবূ দাউদ ৫৯৬, কিতাবুস স্বলাত ঃ বাবুল মারআতে তুসাললি বেগাইরে খেমারিন, আবূ দাউদ ৬৪১, তিরমিযী ৩৭৭, ইবনু মাজাহ্ ৬৫৫, হাকিম ১/২৫১।

২। সহীহ্ ঃ তামামুল মিন্নাহ্ পৃঃ ১৬২।

৩। মুআত্তা ১/১৬০, বাইহাক্বী ২/২৩৩।

৪। তামামুল মিন্নাহ্ পৃঃ ১৬২।

৫। নাইলুল আওতার ১/৫৪৯।

৬। আহমাদ ২/২৩০, বুখারী ৩৬৫, কিতাবুস স্বলাত ঃ বাবুস্ স্বলাতে ফিল কামীসে অস্ সারাবীল অত্ তাবান অল কাবা, মুসলিম ৫১৫, আবূ দাউদ ৬২৫, নাসায়ী ২/৬৯, ইবনু মাজাহ্ ১০৪৭, ইবনু খুযাইমা ৭৫৮।

৭। বুখারী ৩৬৮, কিতাবুস স্বলাত ঃ বাবু মা ইউসতারু মিনাল আওরাহ্, মুসলিম ৫১৬।

নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) নিষেধ করেছেন যেন কেউ স্বলাত আদায় করার সময় নিজের চাদরে শক্তভাবে জড়িয়ে না থাকে। তবে হ্যাঁ যদি সে চাদরের দুটি প্রান্তকেই বিপরীত দিক থেকে ঘাড়ের উপর রাখে (তাহলে জায়েয)।[১]

আবূ সায়ীদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছেঃ

وَ الصَّمَّاءَ : اَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ اَحَدَعَاتِقَيْهِ فَيَبْدُوْا اَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ.

সাম্মা হল নিজের কাপড় নিজের এক ঘাড়ে এমনভাবে রাখা যে এক দিক দিয়ে লজ্জাস্থান অনাবৃত হয়ে যায় এবং দ্বিতীয় কোনো কাপড় সেখানে না থাকে।[২]

(ফোকাহা) আবূ সায়ীদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসে বর্ণিত ব্যাখ্যাই হল সাম্মার সংজ্ঞা।[৩]

(আহলে লুগাত বা অভিধানবিদ) ঃ শরীরে এমনভাবে কাপড় জড়িয়ে রাখা যাতে কোনো প্রান্ত উঁচু না থাকে এবং হাত বের করার মত জায়গাও না থাকে।[৪]

(ইবনু কাসীর রহঃ) — নিষিদ্ধ অবস্থা হল এই যে, কাপড় জড়িয়ে নেওয়া এবং তার প্রান্তভাগ না উঠিয়ে ঝুলিয়ে রাখা।[৫]

আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِى الصَّلاَةِ.

নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) স্বলাতে সাদাল বা কাপড় ঝুলিয়ে রাখতে নিষেধ করেছেন।[৬]

(আবূ উবাইদা রহঃ) — কাপড়ের দুটি প্রান্ত না ঝুলিয়ে সামনের দিকে মিলিয়ে নেওয়া হল সাদল আর যদি মিলিয়ে না নেওয়া হয়, তাহলে সাদল নয়।[৭]

(ইবনু আমীর) — সাদল হল এই যে, লেপের মত করে কাপড় জড়িয়ে রাখা এবং হাতকে ভিতরে রাখা এবং রুকু ও সাজদা করার সময়ও কাপড় ঐভাবেই রাখা। এটাও বলা হয় যে, সাদল হল এই যে, চাদরের মধ্যবর্তী অংশ মাথায় রেখে ডানে বামে না ঝুলিয়ে চাদরের দুটি প্রান্তই ঘাড়ের উপর রাখা ।[৮]

(শাফেয়ী, খাত্তাবী রহঃ) — সাদল হল এই যে, কাপড়কে মাটি পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখা।[৯]

লুঙ্গী (গিঁটের নীচে) যেন না ঝুলে ❶ এবং চুল অথবা কাপড় না গুটিয়ে রাখে ❷	**وَ لاَ يُسْبِلُ وَ لاَ يَكْفِتُ**

(ক) আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেনঃ

لاَ يَنْظُرُ اللّٰهُ اِلٰى مَنْ جَرَّ اِزَارَهُ بَطَرًا.

আল্লাহ্ তাআলা এমন লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না যে নিজের চাদর অহংকারবশতঃ ঝুলিয়ে রাখে।[১০]

---

১ আহমাদ ২/৩১৯।

২। বুখারী ৫৮২০, কিতাবুল লিবাস ঃ বাবু ইশতিমালিস্ সাম্মা, আহমাদ ৬১৩, আবূ দাউদ ২৪১৭, তিরমিযী ১৭৫৮, নাসায়ী ৮/২১০, ইবনু মাজাহ্ ৩৫৫৯। (৩) নাইলুল আওতার ১/৫৫০। (৪) প্রাগুক্ত। (৫) আন্ নেহায়াহ্ লি ইবনে আসীর ২/৫০১।

৬। হাসান ঃ সহীহ্ আবূ দাউদ ৫৯৭, কিতাবুস স্বলাত ঃ বাবু মা জাআ ফিস সাদলে ফিস স্বলাত, আবূ দাউদ ৬৪৩, ইবনু খুযাইমা ৭৭২, আহমাদ ২/১৯৫, দারেমী ১/৩২০, তিরমিযী ৩৭৮, ইবনু মাজাহ্ ৯৬৬। (৭) নাইলুল আওতার ১/৫৫২।

৮। আন্ নেহায়াহ্ ২/৩৫৫। (৯) আল্ মাজমূ ৩/১৭৭, মাআলিমুস সুনান ১/১৭৮।

১০। বুখারী ৫৭৮৮, কিতাবুল লেবাস ঃ বাবু মান জাররা সাওবাহু মিনাল খুয়ালাআ, মুসলিম ২০৮৭, নাসায়ী ৫/৪৯১, আহমাদ ২/৩৮৬, মুআত্তা ২/৯১৪।

(খ) আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন ঃ مَا اَسۡفَلَ مِنَ الۡكَعۡبَيۡنِ مِنَ الۡاَزَارِ فِى النَّارِ.

লুঙ্গী (প্যান্ট, পাজামা ইত্যাদির) যতটা গিঁটের নীচে থাকবে ততটা জাহান্নামের আগুনে থাকবে।[১]

(গ) আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত যে হাদীসে রয়েছে যে, ''কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআলা তিন ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলবেন না, রহমতের দৃষ্টিতে দেখবেন না এবং তাকে বিশুদ্ধও করবেন না বরং তাকে ভয়ানক শাস্তি দেবেন'' - সেই হাদীসে ঐ লোকেরও বিবরণ রয়েছে যে নিজের শালওয়ার (পাজামা, প্যান্ট , লুঙ্গি) গিঁটের নীচে ঝুলিয়ে রাখে।[২]

১৬৮ ঃ লুঙ্গি (বা প্যান্ট, পাজামা ইত্যাদি) গিঁটের নীচে ঝুলিয়ে পরলে কি অযূ বা স্বলাত নষ্ট হয়ে যায়?

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, একজন লোক গিঁটের নীচে কাপড় ঝুলিয়ে স্বলাত আদায় করছিল, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাকে বললেন — اِذۡهَبۡ فَتَوَضَّأۡ.

যাও, অযু কর। সে গেল এবং অযু করে এল। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাকে আবারও অযু করে আসতে বললেন। অতঃপর একজন লোক কারণ জিজ্ঞাসা করলে, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেন—

اِنَّهُ صَلَّى وَ هُوَ مُسۡبِلُ اَزَارِهِ وَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَقۡبَلُ صَلَاةَ رَجُلٍ مُسۡبِلٍ.

এ লোক গিঁটের নীচে কাপড় ঝুলিয়ে স্বলাত আদায় করছিল এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা গিঁটের নীচে কাপড় ঝুলিয়ে রাখা ব্যক্তির ইবাদত কবুল করেন না।[৩]

যেহেতু এ হাদীস যয়ীফ এ জন্য এটি দলীলের উপযুক্ত নয়। তাছাড়া কোনো মুহাদ্দীসও ইসবালে ইযার বা গিঁটের নীচে কাপড় ঝোলানোর জন্য অযু বা স্বলাত নষ্টের কথা বলেন নি। সুতরাং গিঁটের নীচে কাপড় ঝুলিয়ে যারা রাখে তাদের অযু ও স্বলাত শুদ্ধ হবে কিন্তু এ নিষিদ্ধ এ কাজ করার জন্য অবশ্যই তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

১৬৯ ঃ কাপড় ঝুলিয়ে রাখা ইমামের পিছনে স্বলাত কি সহীহ্ হবে?

(ইবনু বায রহঃ) — ওলামাদের দুটি মতামতের মধ্যে বেশি সঠিক হল এই যে, কাপড় ঝুলিয়ে পরা ব্যক্তি এবং অন্যান্য এরকম নাফরমানদের পিছে স্বলাত সঠিক তো হয়ে যাবে কিন্তু এ রকম ধরণের লোকদের ইমাম মনোনীত উচিত হবে না।[৪]

পরবর্তী অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়

১। বুখারী ৫৭৮৭, কিতাবুল লেবাস ঃ বাবু মা আসকালা মিনাল কা'বাইন ফাহুয়া ফিন্ নার, নাসায়ী ৮/২০৭, আহমাদ ২/৪১০, শারহুস সুন্নাহ্ ৬/১৫২।

২। মুসলিম ১০৬, কিতাবুল ঈমান ঃ বাবু বায়ানে গালাযে তাহরীমে ইসবালিল ইযার অলমান্নে বিল আতিয়্যাহ, আবূ দাউদ ৪০৮৭, তিরমিযী ১২১১, নাসায়ী ৫/৮১, আহমাদ ৫/১৪৮।

৩। যয়ীফ ঃ যয়ীফ আবূ দাউদ ১২৪, কিতাবুস স্বলাত ঃ বাবুল ইসবালে ফিস্ স্বলাত, আবূ দাউদ ৬৩৮, বাইহাক্বী ২/২৪১, আহমাদ ৫/৩৭৯, এর সানাদে আবূ জাফর রাবী থেকে বর্ণনাকারী ইয়াহ্ইয়া বিন আবী কাসীর আনসারী মাদানী মুআয্যিন, যিনি অজ্ঞাত ব্যক্তি যেমন ইমাম ইবনু কাত্তান এ কথাই বলেছেন। তারীকীবুত তাহ্যীব গ্রন্থে হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানী লিখেছেন যে, এর হাদীস দুর্বল। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি উপরে বর্ণিত হাদীসের সানাদকে সহীহ্ বলেছেন, তার মনে সংশয় রয়েছে'। মিশকাত ৭৬১, ১/২৩৮, ইমাম শওকানী ও ইমাম মুনযিরী ও আবূ জাফরকে অজ্ঞাত রাবী বলেছেন, নাইলুল আওতার ১/৫৯৯, মুখতাসার সুনান আবী দাউদ ১/৩২৪।

৪। মাজাল্লাতুদ্ দাআহ্ ৯১৩।

শেষ পর্ব

ইসতিক্বামত

উর্দূ ঃ যাফ্রুল হাসান মাদানী

দ্বীনের উপর অটল থাকা

অনুবাদক ঃ আব্দুর রাকীব মাদানী

ইসতিক্বামত তথা দ্বীনের উপর অটল থাকার উপকরণ ঃ— ইসতিক্বামত দ্বীনের একটি বড় মর্যাদার নাম যে মর্যাদা সম্মানিত নাবীগণ অর্জন করে থাকেন এবং এই গুণে তাঁরা গুণান্বিত থাকেন। নাবীগণের সাথে সাথে যাঁরা তাঁদের পূর্ণ অনুসারী হন তারাও সেই মর্যাদায় উন্নিত হন। এই মর্যাদা ও স্তর সব রকমের বাধা বিপত্তি পার করার পরেই অর্জিত হয়। বলতে পারেন, সব ধরণের বাধা বিপত্তি পার করে দ্বীনকে সংরক্ষিত রাখা এবং দ্বীনের উপর অটল থাকার নাম ইসতিক্বামত। প্রতিবন্ধতা শত্রুদের পক্ষ থেকে হয়, অনেক সময় আশেপাশের ঘটনাচক্র অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সময় নিজ নাফস, নাফসের কামনা বাসনা, পরিবার-পরিজন এবং মাল সম্পদের ভালবাসা অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। আর অনেক সময় কারো ভয় কিংবা আশা-আকাঙ্খা বাধা হয়ে যায়। আল্লাহ্ তাআলার আদেশাবলীর উপর অটল থেকে এসব প্রতিবন্ধকতার উপর জয়লাভ করতে পারলে বলা যেতে পারে যে, অমুক ব্যক্তি ইসতিক্বামতের অধিকারী (ওয়াযিহুল বায়ান ফী তাফসীরে উম্মিল কুরআন ২৪৯-৫০)।

ইসতিক্বামত তথা দ্বীনের উপর অটল থাকার বাহ্যত কিছু কারণ রয়েছে, যার পরিপূর্ণ বিবরণ কষ্টসাধ্য। তন্মধ্যে ছয়টি উপকরণের বর্ণনা দেওয়া জরুরী মনে করছি। তা নিম্নে প্রদত্ত হল —

১। দুআ প্রার্থনা ঃ প্রত্যেক মুমিন পুরুষ এবং মুমিনা নারীর জন্য উচিৎ, তারা যেন দ্বীনের উপর অটল থাকার জন্য আল্লাহ্র নিকট দুআ করে। কারণ সবকিছুর দাতা মহান আল্লাহ্। এ কারণে কুরআন ও সুন্নাতে অধিকহারে ইসতিক্বামতের দুআর তাগিদ এসেছে, যার কিছুটা নিম্নরূপ ঃ

(ক) সূরা ফাতিহা যাকে উম্মুল কুরআনও বলা হয়। প্রত্যেক নামাযীকে সমস্ত নামাযে যা পাঠ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। তাতে ইসতিক্বামতের দুআ এভাবে করতে বাল হয়েছে। (হে আল্লাহ্! আমাদের সঠিক পথ দেখাও, সে পথ যে পথে তুমি অনুকম্পা করেছো)।

(খ) সূরা আল্ ইমরাণে ইসতিক্বামতের দুআ এভাবে বর্ণিত হয়েছে, (হে আল্লাহ্! তোমাদের অন্তরসমূহকে হিদায়েত পাওয়ার পর বিচ্যুত করে দিওনা। তোমার পক্ষ হতে আমাদের অনুগ্রহ দান করো; কেননা তুমিই তো একমাত্র দাতা) (আল্ ইমরাণ/৮)।

(গ) আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আল্লাহ্র রসূল আমাকে আদেশ দিয়েছেন, আমি যেন এই দুআটি পাঠ করি, ‘‘আল্লাহুম্মাহ্দিনী ওয়া সাদ্দিদনী’’ ‘‘হে আল্লাহ্ আমাকে হিদায়েত দাও এবং অটল রাখো’’।

আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এও বলেন যে, আল্লাহ্র রসূল আমাকে যখন এই দুআ করতে বলেন, তখন সোজা পথ হতে রাস্তার সোজা এবং সঠিক বলতে তীর নিক্ষেপের সঠিকতার ধারণা করার আদেশ দেন। অর্থাৎ যেমন কোথাও যাওয়ার ইচ্ছা হলে সোজা সেদিকেই যাও এদিক ওদিক ডান বামে যেওনা। সেরূপ আল্লাহ্র নিকট হিদায়েত প্রার্থনা করার সময় সঠিক রাস্তার খেয়াল করা জরুরি যেন গন্তব্য স্থলে পৌঁছানো সম্ভব হয় এবং শরীয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা যায়, অন্ধকার ও ভ্রষ্টতা, বিদ্আত ও খুরাফাতের দিকে সামান্য রকমেরও ইচ্ছা না থাকে। এই সোজা পথের আবেদনের সময় তীরের সোজা নিশানার খেয়াল রাখা প্রয়োজন। যেমন তীর সঠিক নিশানায় গিয়ে লাগে ডানে বামে যায় না, ঠিক তেমন ইলম ও আমলে সঠিকতার খেয়াল রাখা প্রয়োজন যেন তাতে অসত্য প্রবেশ না করতে পারে।

(ঘ) আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এভাবে দুআ করতেন, ‘‘হে আল্লাহ্ আমি তোমার নিকট সঠিক রাস্তা, আল্লাহ্ভীরুতা, হারাম হতে পবিত্রতা এবং অমুখাপেক্ষীতার প্রার্থনা করছি’’ (মুসলিম ২৭২১)।

২। আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন ঃ— সবসময় আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করলে এবং তাঁর নিকট হিদায়েতের প্রার্থনা করলে ইসতিক্বামত অর্জন হয়। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, ‘‘তিনি তোমাদের জন্য দ্বীন নির্ধারণ করেছেন, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন নূহকে এবং যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি তোমাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই বলে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করো এবং ওতে মতভেদ করো না। তুমি অংশীকারীদের যার

প্রতি আহ্বান করছো তা তাদের নিকট দুর্বহ মনে হয়। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং যে তাঁর অভিমুখী হয়, তাকে ধর্মের দিকে পরিচালিত করেন" (সূরাহ্ শূরা/১৩)।

এই আয়াতের শেষাংশে (যে তাঁর অভিমুখী হয়, তাকে ধর্মের দিকে পরিচালিত করেন) মহান আল্লাহ্ স্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়েছেন যে, তিনি তাঁর দ্বীন গ্রহণ করার, সমূহ ইবাদাত তাঁর উদ্দেশ্য একনিষ্ঠভাবে করার এবং দ্বীনের উপর অটল থাকার সুমতি তাকে দেন যে তাঁর ইবাদত ও আনুগত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেন, "যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে আমি অবশ্যই তাদের আমার পথসমূহে পরিচালিত করবো। আর আল্লাহ্ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গেই থাকেন" (সূরাহ্ আনকাবুত/৬৯)।

যারা আমার রাস্তায় সবসময় সংগ্রাম করে, সবসময় এই চিন্তায় থাকে যে কীভাবে আমাকে খুশী করবে, আমার সন্তুষ্টির সবসময় তাকে চিন্তা থাকে, তাহলে আমিও তাকে আমার সন্তুষ্টির রাস্তা দেখিয়ে দেই। অর্থাৎ আমার তাওফীক তার সাথে সবসময় থাকে। তার অন্তরে আমার স্মরণ দৃঢ়রূপে থাকে; বরং ধীরে ধীরে তা বৃদ্ধি পায়। আর এসবের অর্থ হচ্ছে যে, আমি নেক বান্দাদের সাথে থাকি আর তাদের নেক তাওফীক দান করি (তাফসীরে সানাঈ/৪৮৪)।

অনুরূপ হাদীসে কুদসীতে মহান আল্লাহ্ বলেন, "যে ব্যক্তি সৎ কাজ করে তার জন্য দশগুণ বদলা রয়েছে বরং আরও বেশি রয়েছে। আর যে ব্যক্তি পাপ কাজ করে তার জন্য ততখানিই বদলা রয়েছে কিংবা ক্ষমা রয়েছে। আর যে ব্যক্তি পৃথিবী সমান পাপ করার পর আমার সাথে এই অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, সে আমার সাথে কাউকে অংশী করেনি তাহলে আমি তার জন্য অনুরূপ ক্ষমা প্রস্তুত রেখেছি। আর যে আমার দিকে এক বিঘত নিকটে আসবে আমি তার দিকে এক হাত নিকটে আসবো। আর যে আমার দিকে এক গজ নিকটে আসবে আমি তার দিকে দুই গজ নিকটে যাবো। আর যে পায়ে চলার গতিতে আমার দিকে আসবে আমি তার দিকে দৌড়ে আসবো" (মুসলিম, আহমাদ, ইবনু মাজাহ্)।

৩। ইখলাস (আল্লাহ্র ইবাদাতে একনিষ্ঠতা) ঃ— আল্লাহ্ তাআলা তাঁর খাঁটি বান্দাকে এবং যাকে তিনি একান্ত বান্দা বানিয়ে নেন তাকে সব ধরণের মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখেন এবং তাকে দ্বীনের উপর অবিচল রাখেন। নাবী ইউসুফ (আলাইহিস্ সালাম) সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ উল্লেখ করেছেন, "নিশ্চয় সেই মহিলা তার প্রতি আসক্তা হয়েছিল এবং সেও তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়তো, যদি না সে তার প্রতিপালকের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করত। তাকে মন্দ কর্ম ও অশ্লীলতা হতে বিরত রাখার জন্য এইভাবে নির্দেশ দেখিয়েছিলাম। অবশ্যই সে ছিল আমার নির্বাচিত বান্দাদের একজন" (সূরাহ্ ইউসুফ/২৪)।

তাফসীরে সানাঈতে উল্লেখ হয়েছে, কেননা ইউসুফ আমার খাঁটি বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর আমার বিশেষ রহমতের দাবি হচ্ছে, আমার খাস বান্দাদের অবস্থা ও আচরণ সুন্দর হবে। যদি মানুষ হিসাবে কখনও তাদের ভুল হওয়ার উপক্রম হয় তাহলে আমি যেন তাদের তা থেকে বিরত রাখি (তাফসীরে সানাঈ/২৮৪)।

৪। প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহ্র ভয় থাকা (তাকওয়া) ঃ— প্রকাশ্যে ও গোপনে সবসময় এবং সর্বস্থানে আল্লাহ্র ভয় অন্তরে বপন করা। কারণ এর মাধ্যমেই ব্যক্তি নিজেকে পাপ থেকে দূরে রাখে এবং সৎকাজে অগ্রসর হয়। তাকওয়া তথা আল্লাহ্ভীরতার উপর সৎ কাজ নির্ভরশীল। আবু যার গিফারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আল্লাহ্র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন, "হে আবূ যার! তোমাকে আমি আল্লাহ্ভীরতার উপদেশ দিচ্ছি; কারণ তা সবকিছুর মূল। তুমি জিহাদ-সংগ্রাম ধরে থাকবে কারণ তা ইসলামের সন্ন্যাস। আর তুমি অবশ্যই আল্লাহ্র যিকর এবং কুরআনের তিলাওয়াত করতে থাকবে; কারণ তা হচ্ছে উপরে তোমার আত্মার প্রশান্তি স্বরূপ এবং যমীনে তোমার স্মরণ স্বরূপ" (আহমাদ ৩/৮২, সিলসিলাহ্ সহীহ্হা, সহীহুল জামি আস্ স্বগীর ১/২৯৮)।

উক্ত হাদীসে তাকওয়াল্লাহ্ বা আল্লাহ্ভীরুতাকে সবকিছুর মূল তথা ভিত্তি বলা হয়েছে।

প্রজ্ঞার মূল ঃ আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার খুতবায় বর্ণনা করতেন, "সর্বোত্তম পারিতোষিক হচ্ছে আল্লাহ্ভীরুতা এবং প্রজ্ঞা ও হেকমতের মূল হচ্ছে আল্লাহ্ভীতি" (হিলইয়া, আবু নঈম, ১/১৩৮, ইবনু আবী শায়বা, আব্দুর রাজ্জাক, আমসালুল হাদীস, আবুশ সাইক, বায়হাকী শুআবুল ঈমান)।

রসূলুল্লাহ্ সাহাবাদের জন্য তাকওয়ার দুআ করতেন ঃ— আব্দুল্লাহ্ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আল্লাহ্র রসূল খুব কমই কোনো মজলিস থেকে উঠতেন যতক্ষণ না তার সাহাবদের জন্য এই দুআ করতেন, "হে আল্লাহ্! আমাদের মাঝে

তুমি এতো পরিমাণ আল্লাহ্‌ভীতি ভাগ করো যা আমাদের মাঝে ও তোমার প্রতি অবাধ্যচারী হওয়ার মাঝে বাধা হতে পারে এবং আমাদের মাঝে তোমার প্রতি আনুগত্য এত পরিমাণ প্রদান করো যার দ্বারা তুমি আমাদেরকে তোমার জান্নাতে পৌঁছে দিবে, এতটা দৃঢ় প্রত্যয় প্রদান করো যার মাধ্যমে তুমি পৃথিবীর যে কোনো অনিষ্ট আমাদের জন্য সহজসাধ্য করবে, যতক্ষণ আমাদের তুমি জীবিত রাখো, ততক্ষণ আমাদের কর্ণ, আমাদের চক্ষু ও আমাদের শক্তি-সামর্থ্য দিয়ে আমাদের জীবনের উপকরণ দান করো (কিংবা আমাদের চোখ কান মৃত্যু পর্যন্ত তাজা ও সুস্থ রাখো), আর তাকে আমাদের উত্তরাধিকার বানিয়ে দাও। আমাদের উপর যে অত্যাচার করে তার প্রতি আমাদের প্রতিশোধ সুনির্ধারিত করো, আমাদের প্রতি যে দুশমনি করে তার বিরুদ্ধে আমাদেরকে সহযোগিতা করো, আমাদের ধর্ম পালনে আমাদের বিপদাক্রান্ত করো না, দুনিয়া অর্জনকে আমাদের ও আমাদের জ্ঞানের উদ্দেশ্যে রূপান্তর করো না এবং আমাদের প্রতি যে দয়া করবে না তাকে আমাদের উপর প্রভাবশালী (শাসক নিয়োগ) করো না" (তিরমিযী, সূত্র হাসান নং ৩৫০২)।

বর্ণিত দুআয় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বর্ণনা হয়েছে

আল্লাহ্‌ভীরুতার ফযীলত ঃ— কেননা তা বান্দা এবং বান্দার পাপের মাঝে অন্তরায় হয়। সে কারণে যে বান্দা যত বেশি পাপ করে সে ততবেশি আল্লাহ্‌ভীরুতা হতে মহরুম হয়ে যায়। পাপ থেকে বিরত থাকাই সত্যিকারে তাকওয়া তথা আল্লাহ্‌ভীরুতা। আর এটা খুবই সুন্দর জিনিস এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত বড় নিয়ামত। আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) প্রায় তাঁর সাথীদের জন্য আল্লাহ্‌ভীরুতার দুআ করতেন।

এখানে একীন বা দৃঢ় বিশ্বাসেরও ফযীলত প্রমাণিত হয়, কারণ আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, একীনের মাধ্যমে বালা-মসিবত সহজ হয়ে যায়। এটা এভাবে যে, যখন মানুষের মধ্যে এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্ম নেয় যে, তাকে এক দিন না এক দিনে মরতেই হবে এবং কষ্টের এই জগৎ ছেড়ে যেতেই হবে, তখন তার জন্য সমস্ত কষ্ট সহজ হয়ে যায়। আর যার মধ্যে এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, ইবাদাত ও ইতাআতের বদলে আল্লাহ্ তাআলা তাকে প্রচুর বিনিময় দান করবেন, তাহলে তার জন্য কঠিন কাজ সহজ হয়ে যায়। অনুরূপ যার মধ্যে এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, মসিবতের সময় ধৈর্যধারণকারীর বদলা অপরিসীম এবং তিনি ধৈর্যধারণকারীদের সাহায্য করেন, তখন তাকে স্বয়ং বালা-মুসিবত আনন্দদায়ক মনে হয়। এভাবে যখন তার মধ্যে আল্লাহ্‌র শাস্তি, কবরের শাস্তি এবং কিয়ামতের শাস্তির বিশ্বাস দৃঢ় হয়, তখন পাপ বর্জন করা এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ না করা সহজ হয়ে যায়। ফল কথা, ঈমান তথা দৃঢ় বিশ্বাস সমাধান ও সহজের চাবি-কাঠি।

"আমাদের ধর্ম পালনে আমাদের বিপদাক্রান্ত করো না"

দুআর এই অংশের অর্থ হল যে, মুসিবত দুই ধরণের ঃ—

প্রথমটি হল, দুনিয়ার মুসিবত যেমন দারিদ্রতা, দুঃখ-কষ্ট, অসুস্থতা ইত্যাদি। দ্বিতীয়টি হল দ্বীনের মুসিবত, যেমন বিদআতী, ফাসেক, পাপিষ্ট, ব্যভিচারী ও নর্তকীদের সংস্পর্শতা। কেননা এর ফলে ব্যক্তির পরকালের জীবন নষ্ট হয়ে যায়, তার দ্বীনে ঘাটতি হয় এবং সওয়াবের আশা একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। উক্ত কারণে তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন।

পার্থিব জীবনের নিন্দা ঃ কেননা নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাঁর দুআয় বলেন, "দুনিয়ার্জন আমাদের জীবনের বড় উদ্দেশ্য নয়"। এ কারণে যে, দুনিয়া অভিশপ্ত এবং অভিশপ্ত অন্বেষী ও অভিশপ্ত। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, "পৃথিবী অভিশপ্ত এবং তাতে যা আছে তাও অভিশপ্ত কিন্তু আল্লাহ্‌র স্মরণ এবং যে তাকে ভালবাসে কিংবা যে জ্ঞানী নচেৎ জ্ঞান অর্জনকারী" (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ্, বায়হাক্বী, তিরমিযীর উর্দু ব্যাখ্যা হতে সংগৃহীত, লেখক ঃ বদীউয্‌যামান ২/৬০২-৬০৩)।

তাকওয়া তথা আল্লাহ্‌ভীরুতার উদ্দেশ্য ঃ কুরআন ও হাদীসে তাকওয়া অর্জনের অনেক বেশি উপদেশ প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র রসূল সফর এবং ইকামাত উভয় অবস্থাতে তাঁর সাহাবাদের তাকওয়ার উপদেশ দিতেন।

১। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "এবং অবশ্যই আমি তোমাদের পূর্বে যাদের গ্রন্থ প্রদান করা হয়েছিল তাদের এবং তোমাদের উপদেশ দিয়েছি যে, তোমরা সকলে আল্লাহ্‌কে ভয় করো" (সূরাহ্ আন্ নিসা/১৩১)।

২। সাহাবী আবু যার গিফারীকে আল্লাহ্‌র রসূল উপদেশ দেন যে, "যেখানেই অবস্থান করো না কেন আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং পাপের পশ্চাদে নেকি করো। নেকি তা মুছে দিবে এবং মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার করো" (তিরমিযী, বির ও স্বিলা অধ্যায়, মানুষের সাথে সামাজিকতা অনুচ্ছেদ ৩/১২৬, আহমাদ ৫/১৫৩, মুসতাদরাক, বায়হাক্বী, তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ্ বলেছেন

এবং শাইখ আলবানী সহীহুল জামি ১/৮১ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন)।

৩। সাহাবী আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রসূলের খিদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, আল্লাহ্ রসূল! আমি সফরে বের হওয়ার ইচ্ছা করেছি কিন্তু আমার নিকট পাথেয় নেই তাই পাথেয়র ব্যবস্থা করে দিন। তখন আল্লাহ্‌র রসূল তাকে বললেন, ''আল্লাহ্ তাআলা তোমাকে তাকওয়ার পাথেয় দান করুন।'' সাহাবী এটা শুনে দারুন আনন্দিত হয় এবং আরো অধিক উপদেশ কামনা করে। আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''আল্লাহ্ তাআলা তোমার গুনাহ খাতা মাফ করে দিন''। সাহাবী বলল, আল্লাহ্‌র রসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কুরবান যাক আরও উপদেশ দিন। ''তুমি যেখানেই অবস্থান করো না কেন আল্লাহ্ তোমার জন্য সওয়াবের পথ সহজ করে দিন'' (তিরমিযী, দাওয়াত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ নং ২৫ এবং শাইখ আলবানী সহীহুল জামি গ্রন্থে হাসান বলেছেন)।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করল ঃ আমি ভ্রমণে যাচ্ছি তাই আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তখন আল্লাহ্‌র রসূল বললেন ঃ তোমার উপর জরুরি যে, তুমি আল্লাহ্‌কে ভয় করবে এবং প্রত্যেক উঁচু স্থানে তাকবীর বলবে। যখন সেই ব্যক্তি যেতে লাগলো তখন আল্লাহ্‌র রসূল তাকে বললেন ঃ ''হে আল্লাহ্! তার জন্য দূরত্ব কম করে দাও এবং তার জন্য সফর সহজ করে দাও'' (তিরমিযী, দাওয়াত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ নং ২৬, ইবনু মাজাহ্ জিহাদ অধ্যায় ২/৯২২, ইবনু আবি শাইবাহ্, আহমাদ, হাকিম, ইবনু খুযাইমাহ্, আমালুল ইয়াম আল লাইলা, ইবনুস সুন্নী, বায়হাক্বী, সহীহুল জামি আস্ স্বগীর ১/২৯৮)।

দ্বীনের পথে চলার সময় তাকওয়া দ্বারা জ্যোতি অর্জিত হয় ঃ— আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন, ''হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তিনি তোমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ দ্বিগুণ দান করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে আলো দিবেন, যার সাহায্যে তোমরা চলাফেরা করবে এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ্ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (সূরাহ্ হাদীদ/২৮)।

তাকওয়ার মাধ্যমে মুমিনের অন্তরে হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করার শক্তি তৈরি হয় ঃ— আল্লাহ্ তাআলা বলেন, ''হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর,তাহলে তিনি তোমাদেরকে ন্যায়-অন্যায় পার্থক্যকারী শক্তি দিবেন, তোমাদের পাপ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ্ অতিশয় অনুগ্রহশীল'' (সূরাহ্ আনফাল/২৯)।

এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, যে দল আল্লাহ্‌ভীরু হবে তার মধ্যে সত্য-অসত্য এবং ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার একটি বিশেষ শক্তি সৃষ্টি হবে যে কারণে সে বাতিল ও মন্দের দিকে কখনো পা উঠাবে না। তাই পৃথিবীবাসী স্বর্ণ যুগের মুসলিমদের অবস্থা দেখেছে তারা কেমন ছিল। আরবের মরুভূমিবাসী যাদের সমস্ত জীবন উট-ছাগলের রাখালী করতে অতিবাহিত হত, তারা হঠাৎ কীভাবে রোম ও পারস্যের মত সভ্য সম্প্রদায়ের উপর জয় লাভ করে। ভাল-মন্দ পার্থক্য করার এমন শক্তি তাদের মধ্যে চলে আসে যে, তারা যা কিছুই করত তা সত্য, ন্যায়, কল্যাণ ও সৌভাগ্য ছাড়া কিছুই হত না।

৫। স্বলাত (নামায) সম্পাদন ঃ— সঠিক সময় স্বলাত সম্পাদন এবং তা সুন্নাত অনুযায়ী আদায় করাও দ্বীনের উপর অটল থাকার একটি বড় উপকরণ। কারণ প্রিয় নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) স্বলাতের সম্বন্ধে বলেছেন, ''স্বলাত হচ্ছে জ্যোতি'' অর্থাৎ আলো।

১। স্বলাতের বরকতে মুমিনের অন্তরে আলো তৈরি হয়, যার মাধ্যমে তার বক্ষ প্রশস্ত করে দেওয়া হয়, যার ফলে তার অন্তর সত্যকে ভালবাসতে লাগে এবং তা গ্রহণ করে। আর প্রত্যেক মন্দের বিষয়ে তার অন্তরে ঘৃণা সৃষ্টি হয় এবং তা থেকে সে সুরক্ষিত থাকে।

২। স্বলাত স্বলাত আদায়কারীকে মন্দ, নির্লজ্জতা এবং নোংরামি হতে দূরে রাখে এবং সওয়াব ও কল্যাণের পথ দেখায়। মানুষ যেমন আলোতে লাভদায়ক বস্তুকে নিয়ে নেয় এবং কষ্টদায়ক বস্তু হতে নিজেকে হেফাযতে রাখে। সেইরূপ স্বলাত স্বলাত আদায়কারীকে হারাম, অবৈধ এবং অশ্লীলতা থেকে নিরাপদে রাখে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যের প্রতি প্রতিষ্ঠিত রাখে। এ কারণে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, ''তোমরা স্বলাত প্রতিষ্ঠিত করো, অবশ্যই স্বলাত অশ্লীলতা এবং মন্দ থেকে দূরে রাখে'' (সূরাহ্ আনকাবুত/২৫)।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, একদা এক ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রসূলের নিকট আসল এবং বলল, অমুক ব্যক্তি

রাতে স্বলাত আদায় করে আর সকাল হলে চুরি করে। তখন আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''অচিরে তার স্বলাত তাকে চুরি থেকে বিরত রাখবে'' (আহমাদ, বায্যার, ত্বহাভী, সহীহ্ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, দেখুন ঃ সিলসিলাহ্ যঈফা ১/১২)।

৬। ধৈর্যধারণ করা ঃ— ইহ-পরকালীন সকল বিষয়ে ধৈর্য এবং স্বলাতের মাধ্যমে সাহায্য চাওয়ার হুকুম প্রদান করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন, ''হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও স্বলাতের মাধ্যমে সাহার্যপ্রার্থনা করো। নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন'' (সূরাহ্ বাক্বারাহ্/১৫৩)। অনুরূপ রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে আদেশ করেন, ''জেনে রেখো অবশ্যই সাহায্য ধৈর্যের সাথে রয়েছে।''

ইসতিক্বামত তথা দ্বীনের উপর অটল থাকার ব্যাপারে ধৈর্য বিশেষ গুরুত্ব রাখে। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) ঈমান ও আমলের যে ক্ষেত্রেই দ্বীনের উপর অটল থাকতে সক্ষম হয়েছিলেন, তার বড় কারণ ছিল ধৈর্য। উমার বিন খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'আমাদের জীবনের বড় সম্পদ হচ্ছে ধৈর্যধারণ' (বুখারী, রাক্বাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র নিষেধাজ্ঞার প্রতি ধৈর্যধারণ করা)।

আলী বিন আবী ত্বালিবকে একদা কেউ জিজ্ঞাসা করলেন, ঃ হে আমীরুল মুমিনীন! ঈমান কাকে বলে? তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'ঈমান চারটি বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত। (ক) ধৈর্য, (খ) ন্যায়-ইনসাফ,(গ) দৃঢ় বিশ্বাস (ঘ) অভিযান' (শুআবুল ঈমান ১/১৮২, লালাকাঈ শারহুস সুন্নাহ ২/৮২২-৮২৩)।

আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'ধৈর্যের সম্পর্ক ঈমানের সাথে তেমন যেমন শরীরের সাথে মাথার সম্পর্ক। যদি মস্তিষ্ক কেটে দেওয়া হয় তাহলে শরীর অকেজো হয়ে যায়। ঠিক সেভাবে যদি ধৈর্য শেষ হয়ে যায়, তাহলে ঈমানও শেষ হয়ে যায়' (ইবনু আবী শাইবা, ঈমান অধ্যায় ২২ নং ১২০, শারহুস সুন্নাহ লালাকাঈ ২/৮২২, শুআবুল ঈমান ১/১৮৬)।

মহান আল্লাহ্ বলেন, ''হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ধৈর্যধারণ কর। ধৈর্যধারণে প্রতিযোগিতা কর এবং (শত্রুর বিপক্ষে) সদা প্রস্তুত থাক; আর আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার'' (সূরাহ্ আল্ ইমরান/২০০)।

ধৈর্য আল্লাহ্ তাআলার সবচেয়ে বড় দান ঃ— আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, একদা আনসার সাহাবাদের অন্তর্ভুক্ত কিছু সাহাবা আল্লাহ্‌র রসূলের নিকট এসে কিছু চাইলে তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাদের তা প্রদান করলেন। তারা দ্বিতীয়বারে চাইলে তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আবার দিয়ে দিলেন। এমনকী তাঁর নিকট যত সম্পদ ছিল সব শেষ হয়ে গেল। তখন রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেন, ''আমার নিকট যত মাল-সম্পদ জমা হবে আমি সব তোমাদের মাঝে বন্টন করে দিব কিছুই অবশিষ্ট রাখবো না। কিন্তু অবশ্যই মনে রাখবে, যে ব্যক্তি চাওয়া থেকে বাঁচতে চায় আল্লাহ্ তাকে বাঁচাবেন। আর যে ধনী হতে চায় আল্লাহ্ তাকে ধনবান করে দিবেন। আর যে ধৈর্যধারণের চেষ্টা করবে আল্লাহ্ তাকে ধৈর্যধারণের সুমতি দিবেন। ধৈর্য ব্যতীত মহান ও বড় নিয়ামত আল্লাহ্ কাউকে অন্য কিছু প্রদান করেন নি'' (বুখারী যাকাত অধ্যায় ২/২২৫ এবং রাক্বাক্ব অধ্যায় ১১/৩০৩, মুসলিম যাকাত অধ্যায় ২/১৫২-১৫৩, তুহফা সহ আবু দাউদ যাকাত অধ্যায় ২/২৯৫, তিরমিযী বির্র ও সিলা অধ্যায়, ধৈর্যধারণ করা অনুচ্ছেদ, নাসাঈ যাকাত অধ্যায় ১/৬৯২)।

---

৪ পৃষ্ঠার পর —

বিনোদন স্থায়ী মারণ রোগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ আমরা নির্বিকার। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, 'কোনো জনগোষ্ঠিতে যদি পাপ কাজ হয় এবং তথায় অবস্থানরত ব্যক্তিদের ক্ষমতা থাকা সত্বেও যদি তা প্রতিরোধ না করে তাহলে মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহ্ তাদেরকে আযাব দ্বারা গ্রেফতার করবেন (সুনানুবনু মাজাহ্ ৪০০৯)।

উল্লেখ্য ক্রিসমাস ডে উপলক্ষে তৈরিকৃত কেক যে খাবে খাওয়াবে, সে অটোমেটিক তাদের সদস্যরূপে পরিগণিত হবে। অতএব সাবধান উল্লেখিত আয়াতও তার ভাবার্থের পরিপন্থি এমন কোনো কাজ করলেও সহযোগিতা করলে তার ঈমান বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। তাই আমাদের সকলকে এসব হতে দূরে থাকতে হবে এবং সমষ্টিগত ভাবে তা প্রতিরোধের জন্য কর্মসূচী নিতে হবে। যুব সমাজের নিকট ইসলামী মূল্যবোধের বিষয়টিকে বেশি বেশি করে তুলতে ধরতে হবে।

আল্লাহ্ আমাদের হিফাযাত করুন — আমীন।

২য় পর্ব

أحكام الأذان والأقامة

আযান ও ইক্বামাতের বিধান

আবূ হাবীবাহ্ নাজমে আলাম সানাবিলী

(১১) কাযা স্বলাতের জন্য আযানের হুকুম ঃ যদি কেউ সফরের অবস্থায় স্বলাত বলে ভুলে যায়, ঘুমিয়ে যায় অথবা এমন কোনো কর্মে নিমগ্ন হয়ে যায় যাতে তার কোনো স্বাধীনতা থাকে না, কিংবা স্বলাত আদায় না করাতে তার নিকট সঙ্গত কোনো শারয়ী উযর (ওজর) থাকে, এই রকম নিরুপায় অবস্থায় এক অথবা একাধিক স্বলাত ছুটে গেলে তা আদায় করার সময় আযান ও ইকামাত দেওয়া যেতে পারে। স্বলাত যদি বেশি হয় তবে প্রথমে একটি আযান এবং প্রত্যেক স্বলাতের জন্য ইকামাত দেওয়াই যথেষ্ট হবে।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) যখন খায়বারের যুদ্ধ থেকে ফিরছিলেন সারারাত চলার পর ক্লান্ত হয়ে বিলালকে পাহারা দিতে বলে এক জায়গায় ঘুমিয়ে পড়েন এবং অন্যরাও ঘুমিয়ে যান। কিন্তু এক পর্যায়ে বিলালও ঘুমিয়ে পড়েন। সূর্যকিরণ তাঁদের শরীরে পড়তেই সর্বপ্রথম নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) জেগে ওঠেন এবং ওখান থেকে কিছু দূরে গিয়ে বিলালকে আযান এবং ইকামাত দেওয়ার নির্দেশ দেন। অতঃপর জামাআত কায়েম করেন (সহীহ্ মুসলিম হাঃ ৬৮০)।

কিন্তু যদি সে ব্যক্তি শহরে বা গ্রামে হয় তবে শুধু ইকামাত দিয়েই স্বলাত আদায় করবে আযান দিবে না। কারণ এ আযান গ্রামে দেওয়া প্রমাণিত নয়। উপরন্তু যেখানে উক্ত আযানের প্রচলন নেই, সেখানে আযান দিলে বিশৃঙ্খলা হওয়ার আশঙ্কা আছে সুতরাং সেইসব জায়গায় কেবল ইকামাত দিয়েই কাযা স্বলাত আদায় করতে হবে, আযান দেওয়া যাবে না। যেমন , আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, খন্দকের যুদ্ধে মুশরিকরা নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে যুহ্র, আসর, মাগরিব এবং এশা স্বলাত থেকে ব্যস্ত রেখেছিল। সুতরাং রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে ইকামাত দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি ইকামাত দিলেন যুহ্রের স্বলাত আদায় করা হল, অতঃপর আসরের ইকামাত দিলেন আসরের স্বলাত আদায় করলেন। তারপর মাগরিবের ইকামাত দিয়ে মাগরিব স্বলাত আদায় করলেন সব শেষে ইকামাত দিয়ে এশার স্বলাত আদায় করলেন। প্রত্যেকটি স্বলাত সেইভাবেই আদায় করলেন যেভাবে তার সঠিক সময়ে আদায় করে থাকেন (নাসায়ী হাঃ ৬৬১, মুসনাদ আহমাদ হাঃ ১১১৯৮, সহীহ্ ইবনে খুযায়মাহ্ হাঃ ৯৯৬ সূত্র সহীহ)। প্রকাশ থাকে যে, এ মর্মে বর্ণিত যেসব হাদীসে বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)র আযান দেওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে, সেসব হাদীসের সূত্র সহীহ্ নয়।

(১২) মহিলাদের আযান দেওয়ার হুকুম ঃ— এ মর্মে উলামাগণের দুটি প্রসিদ্ধ মতামত রয়েছে। (ক) মহিলাদের জন্য আযান ইকামাত কিছুই দেওয়া জায়েয নয়। (খ) আযান এবং ইকামাত উভয়ই দেওয়া জায়েয।

যাঁরা বলেন, আযান ইকামাত কিছুই দেওয়া জায়েয নয় তাঁদের দলীল সমূহ নিম্নরূপ ঃ

(ক) আসমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন —

قَـالَ رَسُـوْلُ اللهِ ﷺ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ، وَ لَا اِقَامَةٌ

নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, মহিলাদের জন্য আযান ও ইকামাত দেওয়া জায়েয নয় (ইবনে আদীর আল্ কামিল ২/৪৭৯, বাইহাক্বীর সুনানুল কুবরা হাঃ ১৯২১, কিন্তু উক্ত হাদীসের বিশেষ বর্ণনাকারী ''হাকাম ইবনু আব্দিল্লাহ্ আল আইলী''-র যঈফ হওয়ার কারণে হাদীসের সূত্র যঈফ)। (খ) একই কথা নাফে (রাহেমাহুল্লাহ্) কর্তৃক আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-র মত হিসাবে বর্ণিত হয়েছে (মুস্বান্নাফ আব্দির রায্যাক আঃ৫০২২, আল্ জামে' লি আব্দিল্লাহ্ ইবনে অহাব আল মিসরী আঃ ৪৭৮ সূত্র যঈফ। কারণ এর সূত্রে রয়েছে সর্বসম্মতিক্রমে যঈফ রাবী, আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার আল উমরী। উপরন্তু আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার থেকে এর বিপরীত অর্থের আসারও বর্ণিত রয়েছে) এবং (গ) ইকরামা কর্তৃক আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস এর আসার হিসাবে বর্ণিত আছে (মুস্বান্নাফ আব্দির রায্যাক আঃ ৫০২৪, কিন্তু উক্ত আসারের সূত্র দাউদ ইবনিল হুসাইনের কারণে যয়ীফ)।

তবে প্রসিদ্ধ তাবেয়ী আতা ইবনু আবী রাবাহ্ (রাহেমাহুল্লাহ্) এই মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি বলেন, মহিলাদের আযান ও ইকামাত দেওয়ার প্রয়োজন নেই (মুস্বান্নাফ

ইবনে আবী শাইবাহ্ হাঃ ২৩১৩ সূত্র সহীহ্)। একই মত পোষণ করেছেন, মুহাম্মাদ ইবনু শিহাব আয্ যুহরী (মুস্বান্নাফ ইবনে আবী শাইবাহ হাঃ ২৩১৯ সূত্র সহীহ্) এবং তাবা তাবেয়ী যাহ্হাক ইবনু মুযাহিম (মুস্বান্নাফ ইবনে আবী শাইবাহ্ হাঃ ২৩২১ সূত্র হাসান)।

(ঘ) কতক লোক এই মতের দলীল হিসাবে উম্মে অরাকা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-র হাদীস পেশ করেছেন। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আল্লাইহি অ সাল্লাম) তাঁর জন্য একজন মুয়ায্যিন নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি তাঁর জন্য আযান দিতেন আর উম্মে অরাকা নিজের পাড়ার মহিলাদের ইমামতি করতেন (আবু দাউদ হাঃ ৫৯২ সূত্র হাসান)।

তবে এ বিষয়ে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মত হল, যেহেতু আযান ও ইকামাত আল্লাহ্র যিকর, সেইহেতু কিছু শর্তের সাথে তারা আযান ও ইকামাত উভয়ই দিতে পারে। যেমন কোনো বালিকা বিদ্যালয় অথবা মহিলাদের নিজস্ব ইজতেমা, যেখানে কোনো গাইর মাহরাম পুরুষ পর্যন্ত আযান ও ইকামাতের ধ্বনি যাওয়ার আশংকা থাকে না। সেখানে নিচু স্বরে আযান ও ইকামাত দেওয়া যেতে পারে। এই মতের পক্ষে পেশকৃত দলীল সমূহ ঃ (ক) যেমন আস্থাভাজন তাবেয়ী অহব ইবনু কাইসান (রাহেমাহুল্লাহ্) বলেন—

سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ، هَلْ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ ، فَغَضِبَ، قَالَ : أَنَا أَنْهِى عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ.

আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে প্রশ্ন করা হল যে, মহিলাদের জন্য কি আযান দেওয়া আবশ্যিক? প্রশ্ন শুনে তিনি রেগে বললেন, আমি (তাঁদেরকে) আল্লাহ্র যিকর থেকে নিষেধ করবো? (মুস্বান্নাফ ইবনে আবী শাইবাহ্ আঃ ২৩২৪ সূত্র হাসান)। উক্ত অহব ইবনু কাইসান থেকেই, আফ্ফান ইবনু মুসলিম একই আসার বর্ণনা করেছেন (কেবল রেগে যাওয়ার কথাটা নেই)। সেখানে তিনি ইবনু উমারের জায়গায় উমার বলেছেন (আহাদীসু আফ্ফান ইবনে মুসলিম ১/৪১ আঃ ৬৩, কিন্তু তার সূত্র বিচ্ছিন্ন)। কারণ উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)র সাথে অহব ইবনু কাইসানের সাক্ষাৎ ঘটেনি। (খ) বিশ্বাসযোগ্য তাবেয়ী সুলাইমান ইবনু তারেখান বলেন —

كُنَّا نَسْأَلُ أَنَسًا، هَلْ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَ اِقَامَةٌ ؟ قَالَ : لَا ، وَ اِنْ فَعَلْنَ فَهُوَ ذِكْرٌ.

আমরা আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে প্রশ্ন করলাম, মহিলাদের জন্য কি আযান ও ইকামাত দেওয়া অপরিহার্য? তিনি বললেন না, তবে তা (আল্লাহ্র) যিকর, চাইলে তারা দিতে পারে (মুস্বান্নাফ ইবনে আবী শাইবাহ্ আঃ ২৩১৭ সূত্র সহীহ্)। (গ) ইমাম শাফেয়ী (রাহেমাহুল্লাহ্) বলেন —

وَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ، وَ اِنْ أَذَّنَّ، وَ أَقَمْنَ فَلَا بَأْسَ، وَ لَا تَجْهَرُ الْمَرْأَةُ بِصَوْتِهَا.

মহিলাদের জন্য আযান দেওয়া অজেব নয়। তবে যদি তাঁরা আযান ও ইকামাত দেয় তাতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু যেন তাতে স্বর উঁচু না করে (ইমাম শাফেয়ীর 'আল্ উম' ১/১০৩, বাইহাক্বীর মা'রিফাতুস্ সুনানি অল্ আসার ২/২৪৪ আঃ ২৫৫৭ সূত্র সহীহ্)। তিনি অন্য এক জায়গায় বলেছেন —

وَ لَا تَجْهَرُ الْمَرْأَةُ بِصَوْتِهَا تُؤَذِّنُ فِى نَفْسِهَا وَ تُسْمِعُ صَوَاحِبَاتِهَا اِذَا أَذَّنَتْ وَ كَذٰلِكَ تُقِيْمُ اِذَا أَقَامَتْ وَ كَذٰلِكَ اِنْ تَرَكَتْ الْاِقَامَةَ لَمْ أَكْرَهْ لَهَا مِنْ تَرْكِهَا ....

মহিলারা আযানের ধ্বনি উঁচু করবে না বরং নিজে শুনবে এবং নিজের সঙ্গিনীদের শুনাবে এবং ইকামাতেও এমনটাই করবে। আর যদি ইকামাত না দেয় তাতেও কোনো অসুবিধা নেই (ইমাম শাফেয়ীর 'আল্ উম' ১/১০৩)।

(ঘ) উপরে বর্ণিত আতা ইবনু আবী রাবাহ্, মুহাম্মাদ ইবনু শিহাব আয্ যুহরী এবং যাহ্হাক ইবনু মুযাহিম (রাহেমাহুমুল্লাহ্) র মতের সঠিক অর্থ হবে, মহিলাদের জন্য আযান দেওয়া আবশ্যিক নয় বরং তা জায়েয।

(ঙ) এই মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন ইমাম মালেক (বিদাইয়াতুল মুজতাহিদ অ নিহাইয়াতুল মুক্বতস্বিদ ১/১১৮), ইসহাক ইবনু রাহুঅই (মাসাইলুল ইমাম আহমাদ অ ইসহাক্ব ২/৭৪৭), আল্লামাহ্ ইবনু হাযম আয্ যাহিরী (আল্ মুহাল্লা বিল আসার ২/১৬৯), শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া (শারহুল উমদাহ্ ২/১০২), নাওয়াব সিদ্দীক হাসান খান ভুপালী (আর্ রাওযাতুন্ নাদিয়্যাহ্ ১/৭৯), শায়খ আলবানী (সিলসিলাতুল আহাদীস আয্ যাঈফাহ্ ২/২৭১) প্রমুখ। প্রকাশ থাকে যে, আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র ব্যাপারে যে আসার বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি আযান ও

ইকামাত দিতেন এবং মহিলাদের ইমামতি করতেন। আর ইমামতির সময় প্রথম কাতারের মধ্যে দাঁড়াতেন। সে আসারটি সহীহ্ নয়। কারণ তার প্রত্যেক সূত্রেই রয়েছে প্রসিদ্ধ যঈফ রাবী লাইস ইবনু আবী সুলাইম (মুস্তাদরাক হাকেম আঃ ৭৩১, বাইহাক্বীর সুনানুল কুবরা আঃ ৫৩৫৬)।

(১৩) মহিলাদের জন্য পুরুষ মুয়ায্যিন নিযুক্ত করার হুকুম ঃ— তাদের জন্য পুরুষ মুয়ায্যিন নিযুক্ত করা জায়েয। আব্দুর রহমান ইবনু খাল্লাদ আল্ আনসারী (আস্থাভাজন তাবেয়ী) উম্মে অরাকা বিন্তে নাউফাল (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাঁর জন্য একজন (পুরুষ) মুয়ায্যিন নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি তাঁর জন্য আযান দিতেন। আর উম্মে অরাকা নিজের পাড়ার মহিলাদের ইমামতি করতেন। আব্দুর রহমান বলেন, আমি তাঁর মুয়ায্যিনকে দেখেছি তিনি খুব বয়স্ক ছিলেন (আবূ দাউদ, মহিলাদের ইমামতি অনুচ্ছেদ হাঃ ৫৯১, ৫৯২ সূত্র হাসান)। পক্ষান্তরে পুরুষদের জন্য মহিলারা আযান দিতে পারে না (ইমাম শাফেয়ীর 'আল্ উম' ১/১০৩, বাইহাক্বীর মা'রিফাতুস্ সুনানি অল আসার ২/২৪৪ আঃ ২৫৫৭ সূত্র সহীহ্)। আর আল্লামাহ্ স্বালেহ আল্ মুনাজ্জিদ এ মর্মে উলামা গণের ইজমা (ঐক্যমত) বর্ণনা করেছেন (দেখুন ঃ মাউকেউল ইসলাম সাওয়াল অ জাওয়াব ৫/১২৬৬)। আমি বলছিঃ এ ব্যাপারে উলামাগণ কারো কোনো দ্বিমত বর্ণনা করেছেন বলে আমার জানা নেই।

(১৪) ফাসেক ব্যক্তি (যারা বড় পাপের সাথে জড়িত)-র আযান দেওয়ার হুকুম ঃ— আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন —

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَلْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ.

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন, মুয়ায্যিন হবেন নির্ভরযোগ্য (মুসনাদ আহমাদ হাঃ ৮৯১০, সহীহ্ ইবনে খুযাইমাহ্ হাঃ ১৫২৮, সহীহ্ ইবনে হিব্বান হাঃ ১৬৭১ সূত্র হাসান)। উক্ত হাদীস থেকে প্রমাণ উপস্থাপন করে অনেকেই বলেছেন, ফাসেকের জন্য আযান দেওয়া জায়েয নয়। তবে আল্লামাহ্ ইবনু হাযম আয্ যাহিরী বলেন —

يُـجْـزِئُ أَذَانُ الْفَاسِقِ ؛ وَ الْعَدْلُ أَحَبُّ إِلَيْنَا ؛ وَ الصَّيِّتُ أَفْضَلُ.

ফাসেকের আযান যথেষ্ট হবে, কিন্তু আমার নিকট ন্যায়পরায়ণ ও উচ্চ ধ্বনি বিশিষ্ট মুয়ায্যিন পছন্দনীয় (আল্ মুহাল্লাহ্ বিল আসার ২/১৭৮)। তিনি অন্য এক জায়গায় লিখেছেন —

أَمَّـاالْـفَـاسِـقُ فَـإِنَّـهُ أَحَدُنَا بِلَا شَكٍّ ؛ لِأَنَّهُ مُسْلِمٌ ، فَهُوَ دَاخِـلٌ تَـحْتَ قوله ﷺ : "لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ" وَ لَا خِلَافَ فِى اخْتِيَارِ الْعَدْلِ.

নিশ্চয় ফাসেক ব্যক্তি আমাদেরই একজন। কারণ সে মুসলিম। সেও রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর কথা 'যেন তোমাদের একজন আযান দেয়' এর অন্তর্ভুক্ত। তবে আস্থাভাজন মুয়ায্যিন নিযুক্ত করাতে কোনো দ্বিমত নেই (আল্ মুহাল্লা বিল আসার ২/১৭৯)। আর এটাই হল অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মত।

(১৫) সময়ের পূর্বে আযান দেওয়ার হুকুম ঃ— ফরয স্বলাতের আযান তার নির্দিষ্ট সময়েই দিতে হবে। বিশেষভাবে ফজরের এবং মাগরিবের আযান। কারণ ফজরের আযানের সাথে জড়িত রয়েছে সাহরীর সময় এবং মাগরিবের আযানের সাথে জড়িত রয়েছে ইফতারের সময়। তাই ফজর এবং মাগরিবের আযানের সময়ের বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। কিন্তু অনেক সময় ফজরের আযান সময়ের পূর্বে শুনা যায় এবং মাগরিবের আযান সময়ের পরে শুনা যায় যা সঠিক নয়। (ক) আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন—

اَلْإِمَـامُ ضَـامِـنٌ وَ الْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ اَللّٰهُمَّ أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ ، وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِيْنَ.

ইমাম হবেন দায়িত্বশীল এবং মুয়ায্যিন হবেন আস্থাভাজন (আমানতদার)। হে আল্লাহ্! ইমামকে সৎপথ দেখাও এবং মুয়ায্যিনকে মাফ কর (তিরমিযী হাঃ ২০৭, মুসনাদ আহমাদ হাঃ ৮৯৭০ সূত্র হাসান)। অর্থাৎ আযান হ'ল তাঁর জন্য আমানত স্বরূপ। সুতরাং সঠিক সময়ে আযান দিয়ে তাঁকে আমানতদারীর পরিচয় দিতে হবে।

(খ) আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

একদা বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ফজর উদ্ভাসিত হওয়ার পূর্বেই আযান দিয়ে দেন —

فَأَمَرَهُ النَّبِىُّ ﷺ أَنْ يَرْجِعَ فَيُنَادِىَ : أَلَا اِنَّ الْعَبْدَ، قَدْ نَامَ أَلَا اِنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ زَادَ مُوْسَى : فَرَجَعَ فَنَادَى : أَلَا اِنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ.

সুতরাং রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাঁকে নির্দেশ দিলেন যাও ঘোষণা করে দাও যে, ''শুনে রেখো! নিশ্চয় বান্দাহ্ ঘুমিয়ে ছিল, শুনে রেখো! নিশ্চয় বান্দাহ্ ঘুমিয়ে ছিল।'' মুসা ইবনু ইসমাঈল তাঁর বর্ণনায় এতটুকু বেশি বলেছেন, ''অতএব বিলাল গিয়ে ঘোষণা দিলেন, শুনে রেখো! নিশ্চয় বান্দাহ্ ঘুমিয়ে ছিল'' (আবূ দাউদ ৫৩২ সূত্র সহীহ্)। এবং (গ) নাফে' (রাহেমাহুল্লাহ্) বর্ণনা করেছেন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-র মুয়ায্যিন মাসরূহ থেকে যে, তিনি একবার ফজরের আযান সময়ের পূর্বেই দিয়ে দেন। তখন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁকে অনুরূপ নির্দেশ দেন (আবূ দাউদ, সময়ের পূর্বে আযান দেওয়ার অনুচ্ছেদ হাঃ ৫৩৩ সূত্র হাসান)। (ঘ) সালামাহ্ ইবনু আকওয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন —

كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْمَغْرِبَ اِذَا تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ.

সূর্য পর্দার আড়ালে ঢেকে যাওয়ার সাথে সাথেই আমরা নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সঙ্গে মাগরিবের স্বলাত আদায় করতাম (সহীহ্ বুখারী হাঃ ৫৬১, সহীহ্ মুসলিম হাঃ ৬৩৬)। (ঙ) উকবা ইবনু আমের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন—

لَا تَزَالُ أُمَّتِى بِخَيْرٍ أَوْ قَالَ : عَلَى الْفِطْرَةِ مَا لَمْ يُؤَخِّرُوْا الْمَغْرِبَ اِلَى أَنْ تَشْتَبِكَ النُّجُوْمُ.

আমার উম্মাত সর্বদাই কল্যাণ লাভ করবে, অথবা তিনি বললেন, ফিতরাতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যদি তারা তারকারাজি উজ্জ্বল হয়ে উঠা পর্যন্ত মাগরিবের স্বলাতকে বিলম্বিত না করে (আবূ দাউদ হাঃ ৪১৮ সূত্র হাসান)।

অবহিতকরণ ঃ (ক) এশা স্বলাতের জামাআত দেরীতেই কায়েম করা উত্তম। এমনকী অর্ধেক রাত পর্যন্ত বিলম্ব করা যায় (সহীহ্ বুখারী হাঃ ৫৭২)। (খ) প্রচণ্ড গরমের সময় যুহ্রের স্বলাত ঠাণ্ডা করে (বিলম্বে করে, গরমের প্রচণ্ডতা কমলে) আদায় করা ভালো (সহীহ্ বুখারী হাঃ ৫৩৩। তাছাড়া অন্যান্য স্বলাত প্রথম অক্তেই আদায় করা উত্তম।

(১৬) আযান দেওয়ার স্থান ঃ মিনার অথবা কোনো উঁচু জায়গা থেকে আযান দেওয়া সুন্নাত। (ক) উক্বা ইবনু আমের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন —

يَعْجَبُ رَبُّكُمْ مِنْ رَاعِى غَنَمٍ فِى رَأْسِ شَظِيَّةٍ بِجَبَلٍ، يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ ، وَ يُصَلِّى ، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ.

যখন কোনো ছাগলের রাখাল পাহাড়ের চূড়ায় স্বলাতের জন্য আযান দিয়ে স্বলাত আদায় করে তখন তোমাদের রব তার আমলে অবাক হয়ে (তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে) মহান আল্লাহ্ বলেন, ... (আবূ দাউদ হাঃ ১২০৩, সূত্র সহীহ্)। মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রাহেমাহুল্লাহ্) উক্ত হাদীসের শব্দ 'শাযিয়্যাতুন' সম্পর্কে লিখেছেন —

قِطْعَةٌ مُرْتَفِعَةٌ فِى رَأْسِ الْجَبَلِ وَ فِيْهِ اِشَارَةٌ اِلَى اسْتِحْبَابِ الْأَذَانِ عَلَى الْمَكَانِ الْمُرْتَفِعِ وَ لَوْ كَانَ عَلَى الْجَبَلِ.

পাহাড়ের চূড়ার উঁচু অংশ। তা দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, উঁচু জায়গায় আযান দেওয়া মুস্তাহাব যদিও পাহাড় এর উপর হয় (আস্ সামারুল মুস্তাহাব ১/১৬০)। (খ) উরুয়া ইবনুয্ যুবায়র (রাহেমাহুল্লাহ্) নাজ্জার গোত্রের একজন মহিলা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন —

كَانَ بَيْتِى مِنْ أَطْوَلِ بَيْتٍ حَوْلَ الْمَسْجِدِ، فَكَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ عَلَيْهِ الْفَجْرَ كُلَّ غَدَاةٍ.

আমার বাড়ি মাসজিদের পাশে সবচেয়ে উঁচু বাড়ি ছিল। সুতরাং বিলাল প্রতিদিন ফজরের আযান তার উপর থেকেই দিতেন

(সীরাতু ইবনে হিশাম ২/১১২, আবূ দাউদ, মিনারের উপর আযান দেওয়ার অনুচ্ছেদ হাঃ ৫১৯, বাইহাক্বীর সুনানুল কুবরা, মিনারে আযানে অনুচ্ছেদ হাঃ ১৯৯৫, সূত্র হাসান। হাদীসের কেন্দ্রীয় রাবী মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক আস্ সাবীয়ী, ইবনু হিশামের বর্ণনায় নিজের শ্রবণ স্পষ্ট করেছেন)। (গ) আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন —

وَ كَانَ قِيَامُهُ قَدْرَ مَا يَنْزِلُ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْمَنَارَةِ وَ يَصِلُ اِلَى الصَّفِّ.

মুয়ায্যিনের মিনার থেকে নেমে কাতারে শামিল না হওয়া পর্যন্ত রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) স্বলাত আরম্ভ করতেন না (মুসনাদ আহমাদ হাঃ ৮৪২৩ সূত্র হাসান)। (ঘ) আম্মা আয়েশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রাত্রের দুই আযান (সাহারী খাওয়ার আযান ও ফজরের আযান) এর মধ্যে সময়ের ব্যবধান সম্পর্কে বলেন — وَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا اِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَ يَرْقَى هَذَا.

একজন আযান দিয়ে নীচে নামতেন আর অপরজন আযান দেওয়ার জন্য উপরে উঠতেন (সহীহ্ মুসলিম হাঃ ১৮২৯)। (ঙ) আস্থাভাজন তাবেয়ী আব্দুল্লাহ্ ইবনু শাক্বীক্ব আযান ও ইকামাতের সুন্নাত সম্পর্কে বলেন —

مِنَ السُّنَّةِ الْأَذَانُ فِى الْمَنَارَةِ ، وَ الْاِقَامَةُ فِى الْمَسْجِدِ ، وَ كَانَ عَبْدُ اللهِ ، يَفْعَلُهُ.

মিনারে আযান দেওয়া এবং মাসজিদে ইকামাত দেওয়া সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। আর আব্দুল্লাহ্ এটাই করতেন (মুস্বান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ্, মুয়ায্যিনের মিনার অথবা তার মতো কোনো জায়গা থেকে আযান দেওয়ার অনুচ্ছেদ হাঃ ২৩৩১ সূত্র সহীহ্, আলবানীও তার সূত্রকে সহীহ্ বলেছেন)। (চ) সায়িব ইবনু ইয়াযীদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-র খিলাফতকালে যখন মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল তখন তিনি জুমুআর স্বলাতের জন্য যাউরা নামাক বাজারে একটি ঘরের ছাদের উপর তৃতীয় আযান দেওয়ার নির্দেশ দিলেন (ইবনু মাজাহ্ হাঃ ১১৩৫ সূত্র সহীহ)।

জ্ঞানদীপ্ত পাঠক! উপরিল্লিখিত হাদীসগুলি থেকে স্পষ্টভাবেই বোঝা গেল যে, আল্লাহ্ তাআলা উঁচু স্থানে আযান দেওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। ফলে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এবং সাহাবীগণের যুগে, এমনকী তাবেয়ীদের যুগেও তার উপরেই আমল জারী থেকেছে। কোনো দিন মাসজিদের ঘরের ভিতর থেকে আযান দেওয়া হয়নি। কিন্তু মাইক আসার পর থেকে এ সুন্নাত অবহেলিত। যেসব মাসজিদে মাইক নেই সেখানেও এর উপর আমল করা হয় না। তবে মাইক থাকলেও মাসজিদের ঘরে থেকে আযান না দিয়ে, বারান্দা কিংবা বারান্দা সংলগ্ন মাসজিদ চত্বরের কোনো স্থান থেকেই আযান দেওয়া অতি উত্তম।

(১৭) আযানের জন্য নিয়ত করা ঃ আযান ও ইকামাতের জন্য নিয়্যাত করা আবশ্যিক কারণ এটাও একটা নেক আমল। আর প্রত্যেক আমল যা আল্লাহ্ তাআলাকে সন্তুষ্ট করার মাধ্যম হবে তার জন্য নিয়্যাত শর্ত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি —

اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَ اِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ....

প্রত্যেক কাজ নিয়তের (ইচ্ছার) সাথে সম্পর্কিত। আর মানুষ তার ইচ্ছা অনুযায়ী ফল পাবে (সহীহ্ বুখারী হাঃ ১)। তবে মুখে কোনো শব্দ উচ্চারণ করতে হবে না। বরং অন্তরের ইচ্ছায় হবে যথেষ্ট।

(১৮) আযান দেওয়ার পূর্বে অযু করা ঃ এ ব্যাপারে (ক) আম্মা আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন —

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাঁর প্রতিটি সময়েই আল্লাহ্ তাআলার যিকর করতেন (সহীহ্ মুসলিম হাঃ ৫৫৮) এবং ইব্রাহীম নাখায়ী (রাহেমাহুল্লাহ্) বলেন —

لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، ثُمَّ يَنْزِلُ فَيَتَوَضَّأُ.

বিনা অযুতে আযান দেওয়ায় কোনো অসুবিধা নেই। অতঃপর সেখান থেকে নেমে অযু করে নেবে (ইমাম বুখারী আসারটি মুয়াল্লাক বর্ণনা করেছেন, তবে মুস্বান্নাফ ইবনে আবী শায়বায় সূত্রসহ বর্ণিত হয়েছে আঃ ২১৮৮ সূত্র সহীহ্)। পক্ষান্তরে আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে তিনি বলেন —

أَنَّ رَجُلاً مَرَّ وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَبُوْلُ ، فَسَلَّمَ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ.

এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করল, তখন নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) প্রস্রাব করছিলেন। সে ব্যক্তি নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে সালাম দিল। কিন্তু তিনি তার সালামের উত্তর দিলেন না (সহীহ্ মুসলিম হাঃ ৫৫৫)। ইবনু উমার থেকেই অন্য এক বর্ণনায় আছে তিনি একটি দেওয়ালের কাছে গিয়ে তায়াম্মুম করলেন অতঃপর তার সালামের উত্তর দিলেন (আবূ দাউদ হাঃ ৩৩১ সূত্র হাসান) এবং জাবের ইবনু আব্দিল্লাহ্ কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীসে আছে যে, তিনি তার সালামের উত্তর না দিয়ে তাকে বললেন, যখন তুমি আমাকে এহেন অবস্থায় পাবে আমাকে সালাম দিও না। আর যদি তুমি এমনটা করো তবে আমি তোমার উত্তর দেবো না (ইবনু মাজাহ্ হাঃ ৩৫২ সূত্র হাসান)। সুতরাং ইবনু কুদামাহ্ (রাহেমাহুল্লাহ্) লিখেছেন —

اَلْمُسْتَحَبُّ لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يَكُوْنَ مُتَطَهِّرًا مِنَ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ وَ الْجَنَابَةِ جَمِيْعًا.

মুয়ায্যিনের জন্য উত্তম হল ছোট বড় সকল অপবিত্রতা থেকে পাক হয়ে আযান দেওয়া (আল্ মুগনী ১/২৪৮)। বোঝা গেল বিনা অযুতে আযান দেওয়া জায়েয হলেও আযান দেওয়ার পূর্বে অযু করে নেওয়া উত্তম।

(১৯) দাঁড়িয়ে আযান দেওয়ার হুকুম ঃ (ক) আবূ ক্বাতাদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে বললেন —

يَا بِلَالُ ، قُمْ فَأَذِّنْ بِالنَّاسِ بِالصَّلَاةِ.

হে বিলাল! দাঁড়াও স্বলাতের জন্য (মানুষের মধ্যে ঘোষণা) আযান দাও (সহীহ্ বুখারী হাঃ ৫৯৫)। (খ) অনুরূপভাবে আবূ মাহযূরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কেও বলেছিলেন —

قُمْ فَأَذِّنْ بِالصَّلَاةِ.

দাঁড়াও স্বলাতের জন্য আযান দাও (মুসনাদুশ শাফেয়ী ১/৩০, মুসনাদ আহমাদ হাঃ ১৫৩৮০, সুনানুন নাসায়ী হাঃ ৬৩২ সূত্র হাসান)। (গ) ইবনুল মুনযির (রাহেমাহুল্লাহ্) এ মর্মে উলামাগণের ইজমা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন —

أَجْمَعُوْا عَلَى أَنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ قَائِمًا ، وَ انْفَرَدَ أَبُوْ ثَوْرٍ فَقَالَ : يُؤَذِّنُ جَالِسًا مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ.

আবূ সাউর ব্যতীত সমস্ত উলামাগণ এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, আযান দিতে হবে দাঁড়িয়ে। কেবল তিনিই বিনা কারণে বসে আযান দেওয়া জায়েয বলেছেন (ইবনুল মুনযের এর আল ইজমা ১/১৮ বিষয় ৪০)। একই রকম কথা বলেছেন, শায়খ স্বালিহ আল্ মুনাজ্জিদ (রাহেমাহুল্লাহ্) তিনি বলেন —

اَلسُّنَّةُ أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ قَائِمًا ، كَمَا كَانَ يَفْعَلُ مُؤَذِّنُوْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَ كَمَا سَارَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ اِلَى يَوْمِنَا هَذَا، وَ انْعَقَدَ عَلَيْهِ اِجْمَاعُ الْكَافَّةِ، فَإِنْ أَذَّنَ قَاعِدًا أَوْ مُضْجِعًا لِغَيْرِ عُذْرٍ، صَحَّ أَذَانُهُ مَعَ الْكَرَاهَةِ.

সুন্নাহ্ হ'ল মুয়ায্যিনের দাঁড়িয়ে আযান দেওয়া। যেমনটা করেছেন রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর মুয়ায্যিনগণ। যার উপর অদ্যাবধি মুসলিমগণ কায়েম আছেন এবং যার উপর সকলের ইজমা সংঘটিত হয়েছে। তবে যদি কেউ বিনা কোনো ওজরে বসে অথবা শুয়ে আযান দেয়, অপছন্দনীয় হলেও তা সঠিক হবে (মাউকেউল ইসলাম সাওয়াল জবাব ৫/১২১৮)।

(২০) আযান দেওয়ার সময় ক্বিবলামুখী হওয়া ঃ— এ মর্মে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) থেকে কোনো হাদীস বর্ণিত হয়নি। তবে তাবেঈনদের কিছু আসার বর্ণিত হয়েছে। যেমন (ক) আব্দুল মালেক ইবনু জুরাইজ বলেন —

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ

আমি আতা ইবনু আবী রাবাহ্‌কে বললাম, মুয়ায্যিন কি ক্বিবলামুখী হয়ে আযান দিবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ (মুস্বান্নাফ আব্দির রায্যাক ১/৪৬৫ আঃ ১৮০২ সূত্র সহীহ্)। (খ) মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (রাহেমাহুল্লাহ্) বলেন —

اِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.

মুয়ায্যিন যখন আযান দিবে ক্বিবলামুখী হয়ে আযান দিবে (মুস্বান্নাফ আব্দির রায্যাক ১/৪৬৬ আঃ ১৮০৪ সূত্র সহীহ্)।

(গ) মুজাম্মি' ইবনু ইয়াহ্ইয়া আল আনসারী বলেন —

كُنْتُ مَعَ أَبِى أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ وَ هُوَ مُسْتَقْبِلٌ الْمُؤَذِّنَ وَ كَبَّرَ الْمُؤَذِّنُ وَ هُوَ مُسْتَقْبِلٌ الْقِبْلَةَ.

আমি আবূ উমামাহ্ ইবনু সাহালের সাথে ছিলাম এবং তিনি মুয়ায্যিন অভিমুখী ছিলেন মুয়ায্যিন ক্বিবলামুখী হয়ে আযান দিল (মুসনাদ আস সার্রাজ ১/৫২ আঃ ৬১ সূত্র সহীহ্, মুহাদ্দিস যুবায়র আলী যায়ী এবং শায়খ ইরশাদুল হাক্ব আসারী তার সূত্রকে সহীহ্ বলেছেন)। উপরন্তু আল্লামাহ্ ইবনু মুনযির এ মর্মে উলামাগণের ইজমা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন —

أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ بِالْأَذَانِ.

উলামাগণ এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, ক্বিবলামুখী হয়ে আযান দেওয়া সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত (আল্ আউসাত্ব ফিস্ সুনানি অল ইজমা ৩/২৮)। তিনি অন্য এক স্থানে বলেছেন—

وَ أَجْمَعُوْا عَلَى اَنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةُ بِالْأَذَانِ.

তাঁরা এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, আযান দেওয়ার সময় ক্বিবলামুখী হতে হবে (আল্ ইজমা ১/৩৮ বিষয় ৩৯)।

(২১) আযান দেওয়ার সময় কানের মধ্যে আঙ্গুল ঢোকানো, এবং (২২) ''হাইয়া আলাস্ব স্বলাহ্ এবং হাইয়া আলাল ফালাহ্'' বলার সময় ঘাড় ডানে এবং বামে ফিরানো ঃ—

(ক) আবূ জুহায়ফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন —

رَأَيْتُ بِلَالًا يُؤَذِّنَ وَ يَدُوْرُ وَ يُتْبِعُ فَاهُ هَاهُنَا، وَ هَاهُنَا ، وَ اِصْبَعَاهُ فِى أُذُنَيْهِ.

আমি বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে আযান দিতে দেখলাম এবং তাঁকে এদিক সেদিক ঘুরতে ও মুখ ঘুরাতে দেখলাম। তাঁর (দুই হাতের) দুই আঙ্গুল উভয় কানের মধ্যে ছিল (মুসনাদ আহমাদ হাঃ ১৮৭৫৯, জামেউত তিরমিযী হাঃ ১৯৭ সূত্র হাসান)।

তিনি আরো বলেন —

رَأَيْتُ بِلَالًا خَرَجَ اِلَى الْأَبْطَحِ فَأَذَّنَ فَلَمَّا بَلَغَ حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، لَوَى عُنُقَهُ يَمِيْنًا وَ شِمَالًا ، وَ لَمْ يَسْتَدِر.

আমি বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে আবতাহের দিকে গিয়ে আযান দিতে দেখলাম। যখন তিনি ''হাইয়া আলাস্ব স্বলাহ এবং হাইয়া আলাল ফালাহ্''-য় উপনীত হলেন নিজের ঘাড় ডানে এবং বামে ফিরালেন (ঘুরালেন) নিজে সম্পূর্ণ ঘুরলেন না (আবূ দাউদ, আযান দেওয়ার সময় মুয়ায্যিনের ঘুরার অনুচ্ছেদ হাঃ ৫২০ সূত্র সহীহ্) ইমাম তিরমিযী বলেন —

عَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ : يَسْتَحِبُّوْنَ أَنْ يُدْخِلَ الْمُؤَذِّنُ اِصْبَعَيْهِ فِى أُذُنَيْهِ فِى الْأَذَانِ.

আযানের সময় মুয়ায্যিনের কানে আঙ্গুল দেওয়ার উপরেই উলামাগণের আমল রয়েছে আর এটাকেই মুস্তাহাব বলেছেন (জামেউত তিরমিযী ১৯৭ হাদীসের ব্যাখ্যায়)।

(২৩) আযানের পূর্বে ''আউযুবিল্লাহ্ অথবা আউযুবিল্লা-হি মিনাশ্ শায়ত্বা-নির রজীম'' এবং ''বিস্মিল্লাহ্ অথবা বিস্মিল্লা-হির রহমা-নির রহীম'' বলা ঃ সৌদি আরবের স্থায়ী ফাতাওয়া কমিটিকে এ মর্মে প্রশ্ন করা হলে, তাঁরা উত্তর দিয়েছেন —

لَا نَعْلَمُ أَصْلًا يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوْعِيَّةِ التَّعَوُّذِ وَ الْبَسْمَلَةِ قَبْلَ الْأَذَانِ ، لَا بِالنِّسْبَةِ لِلْمُؤَذِّنِ وَ لَا مَنْ يَّسْمَعُهُ.

আযানের পূর্বে আউযুবিল্লাহ্ ও বিস্মিল্লাহ্ বলা জায়েয হওয়ার জন্য কোনো দলীল আমাদের জানা নেই। না মুয়ায্যিনের জন্য এবং না শ্রবণকারীর জন্য (ফাতাওয়া লাজনাতুদ্ দায়িমাহ্ ৬/১০১, ফাতাওয়া নম্বর ৬৩২১)।

হাদীস ও আসার এর গ্রন্থসমূহে এমন কোনো দলীল বর্ণিত হয়নি যার উপর ভিত্তি করে, আযানের পূর্বে আউযুবিল্লাহ্ ও

বিস্‌মিল্লাহ্ বলাকে জায়েয বলা যাবে। না মুয়ায্‌যিনের জন্য এবং না শ্রবণকারীর জন্য।

(২৪) আযানের পূর্বে কুরআনের কিরাআত করার হুকুম ঃ শায়খ হিসামুদ্দীন আফানাহ্ (রাহেমাহুল্লাহ্) এর উত্তর এভাবে দিয়েছেন যে, নিশ্চয় কুরআনুল কারীমের কিরাআত এমন মহান ইবাদাত, যা দ্বারা বান্দাহ্ তার রবের নৈকট্য লাভ করে থাকে। তা সর্বসময় জায়েয। কিন্তু আযানের পূর্বের সময়ের সাথে নির্দিষ্ট করা এবং তা ধারাবাহিকভাবে করা নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সুন্নাত বিরোধী। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) থেকে এমন কোনো দলীল বর্ণিত নেই যে, তিনি মুয়ায্‌যিনকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আযানের পূর্বে কিরআত করতে হবে এবং তার জায়েয হওয়ার কোনো দলীল বিদ্যমান নয়। সুতরাং এ আমল ছেড়ে দেওয়া উচিৎ। কারণ শারয়ী দলীল ছাড়া কোনো ইবাদাতকে বিশেষ কোনো সময়ের সাথে নির্দিষ্ট করা বিদ্‌আত এবং রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সুন্নাত বিরোধী (ফাতাওয়া হিসাম আফানাহ ৬/১৫৬)।

(২৫) আযানের পূর্বে বা পরে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর উপর উচ্চস্বরে দরূদ পাঠ করা ঃ সৌদি আরবের স্থায়ী ফাতাওয়া কমিটিকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে, তাঁরা উত্তরে বলেন —

নিশ্চয় তা নব আবিষ্কৃত বিদআত। না নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর যুগে ছিল, না খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে এবং না সাহাবা (রাযিয়াল্লাহু আনহুমের) যুগে ছিল (ফাতাওয়া লাজনাতুদ দায়িমাহ্ ৬/১১০)।

বিজয়ী বীর

খাইরুল আনাম

খ্রিস্টান ধর্মের প্রবর্তক যিশু খ্রিষ্ট জেরুজালেমে জন্মগ্রহণ করেন। জেরুজালেম তাই খ্রিস্টানদের কাছে পবিত্র ভূমি। আরব সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় খালিফা উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে জেরুজালেমসহ সমগ্র প্যালেস্টাইন দখল করেন। তারপর দীর্ঘ চারশো বছর জেরুজালেম মুসলিমদের অধিকারে থেকে যায়। ইউরোপের খ্রিস্টধর্মাবলম্বী মানুষ সেই পবিত্র ভূমি পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে ১০৯৬ খ্রিস্টাব্দে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করে। প্রায় ২০০ বছর ধরে এই যুদ্ধ চলেছিল। শেষ পর্যন্ত মুসলিম সুলতান সালাউদ্দিন আইয়ুবী ও ইংল্যান্ডের খ্রিস্টান রাজা রিচার্ডের মধ্যে ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এরপরেও ইউরোপের অন্যান্য দেশের নেতৃত্বে এই যুদ্ধ আরো একশ বছর বিচ্ছিন্নভাবে চলেছিল, কিন্তু যুদ্ধের সেই উন্মাদনা আগের মত ছিল না। খ্রিস্টান যোদ্ধারা তাদের পোশাকে লাল 'ক্রুস ' এঁকে যুদ্ধের শপথ গ্রহণ করত বলে এই যুদ্ধকে 'ক্রুসেড' বলে।

১১৯২ খ্রিস্টাব্দে রাজা রিচার্ড ও সুলতান সালাউদ্দিনের সেনাবাহিনীর মধ্যে জেরুজালেমের অধিকার নিয়ে ভয়ানক যুদ্ধ চলছে। হঠাৎ একদিন রিচার্ডের সেনা শিবির থেকে সাময়িক যুদ্ধ বিরতির জন্য সাদা নিশান উড়তে দেখা গেল।

কী ব্যাপার!

খবর নিয়ে জানা গেল, রাজা রিচার্ড ভীষণ অসুস্থ।

যুদ্ধের নীতি অনুসারে যুদ্ধ বিরতি সাতদিন পর্যন্ত কার্যকরী থাকে। সেই অনুসারে সালাউদ্দিনের সেনাবাহিনী সাতদিন পর্যন্ত যুদ্ধ বিরতি মেনে চলল। তারপরেও কিন্তু রিচার্ডের শিবির থেকে সাদা নিশান সরানো হলনা। এই সময় সালাউদ্দিনকে তাঁর সৈন্যরা পরামর্শ দিল ঃ আমরা যুদ্ধ বিরতির নিয়ম মেনেছি। কাজেই এবার আপনি যুদ্ধ শুরু করুন। তাছাড়া শত্রুপক্ষের সেনাপতির বিপদকে কাজে লাগিয়ে আমরা সহজেই জয়লাভ করতে পারব।

কিন্তু সুলতান সালাউদ্দিন তাঁর সৈন্যদের কোনো কথাই শুনলেন না। তিনি তাঁর সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বীরদর্পে ঘোষণা

করলেন, শত্রুপক্ষের রাজার অসুস্থতার সুযোগে যুদ্ধ করে বিজয়ী হওয়াকে আমি ঘৃণা করি।

এই ঘোষণার পর যুদ্ধ বিরতি চলতেই থাকল। রিচার্ডের সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য সুলতান অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু যত দিন যায় ততই রিচার্ডের অবস্থা খারাপ হতে থাকে। রাজা নিজেও ধরে নিয়েছেন তাঁর মৃত্যু আসন্ন। একদিন সন্ধ্যার কিছু পরে একজন আলখাল্লা পরিহিত মুসলিম ফকির রিচার্ডের শিবিরে এসে হাজির হলেন।

ফকির শিবিরের প্রহরীকে বললেন ঃ শুনেছি আপনাদের রাজা ভীষণ অসুস্থ। আমি একজন হেকিম। আপনাদের রাজাকে একবার চিকিৎসা করে দেখতাম।

প্রহরী ভিতরে গিয়ে রাজাকে সে খবর জানালেন। রাজাও কৌতুহল বশে সেই ফকিরকে ভিতরে আসার অনুমতি দিলেন।

ফকির রাজার অবস্থা দেখে ওষুধ নির্বাচন করে খাওয়ালেন। তারপর রাজার পাশে বসে রাজার সেবা করতে লাগলেন। ফকিরের ওষুধ খেয়ে রাজা রিচার্ড কিছুটা আরাম বোধ করলেন। তারপর ভোর হওয়ার আগে ফকির শিবির থেকে বের হয়ে নিজের বাড়ির দিকে চলে গেলেন। আর বলে গেলেন, তিনি কাল আবার আসবেন।

এইভাবে চলতে থাকল। ফকির প্রতিদিন সন্ধ্যার পর রাজার কাছে এসে রাজাকে ওষুধ খাওয়ান আর রাজার পাশে বসে রাজার সেবা করতে থাকেন। কয়েকদিন যাওয়ার পর ফকিরের চিকিৎসার সুফল বুঝতে পারা গেল। রাজা রিচার্ড থেকে সাধারণ সৈনিক পর্যন্ত সকলেই ফকিরকে শ্রদ্ধা করতে লাগলেন। ঠিক এক মাস পর রাজা প্রায় সুস্থ হয়ে উঠলেন। সকলেই ভীষণ খুশি। রিচার্ডেরও মন কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল। প্রতিদিনের মত এদিনও ভোরবেলায় বাড়ি যাওয়ার জন্য ফকির প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তিনি রাজার কাছে গিয়ে বললেন , আমার চিকিৎসায় আপনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন। আমি সফল। কাল থেকে আমার আর আসার দরকার হবেনা। আমি চললাম।

ফকির বেরিয়ে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েছেন। রিচার্ড বিছানা থেকে উঠে ফকিরকে বললেন, হে ফকির! আমার অনুমতি না নিয়ে যাওয়ার স্পর্ধা পেলে কোথা থেকে? আমি কি এতই বোকা, তোমার পরিচয় না নিয়ে, তোমার সম্পর্কে কিছু না জেনে তোমাকে ছেড়ে দিব? তুমি আমাকে একমাস চিকিৎসা আর সেবা করে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে এনেছো। আমি তোমার কোনো খোঁজ না নিয়ে তোমাকে চলে যেতে দিব? এবার সত্যি করে বল, কে তুমি, কোথা থেকে এসেছো? কোনো মিথ্যার আশ্রয় নিলে তোমাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলব।

ফকির ঘুরে দাঁড়িয়ে রাজার কাছে এসে বললেন, আপনি আমার সম্পর্কে জানতে চাইছেন? দেখুন আমি কে? এই বলে সেই ফকির তাঁর আলখাল্লা খুলে ফেললেন। তারপর দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, এবার চিনেছেন আমি কে?

হঠাৎ যদি সেখানে বজ্রপাত হতো, তাতে রিচার্ড যতটা না বিস্মিত হতেন, তার চেয়ে হাজার গুণ বিস্মিত হলেন ফকিরকে দেখে।

আরে এত সুলতান সালাউদ্দিন। তাঁর চরম শত্রু। তাঁকেই তো হত্যা করার জন্য সুদূর ইউরোপ থেকে তিনি এখানে এসেছেন যুদ্ধ করতে। রিচার্ডের সব অহংকার আর আভিজাত্য স্তিমিত হয়ে পড়ল। বিস্ময়ভরা কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন ঃ শত্রুর প্রতি আপনার এ কীরূপ ব্যবহার সুলতান?

সুলতান স্থির কণ্ঠে বললেন , আপনি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, এ খবর আমাকে বিচলিত করে তুলেছিল। আপনি শত্রু হলেও আমার দেশে আপনি অতিথি। অতিথির বিপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া আমাদের নৈতিক কর্তব্য, ইসলামের আহ্বান।

রিচার্ড ধীরে ধীরে বিছানা থেকে উঠে সুলতান সালাউদ্দিনকে জড়িয়ে ধরে বললেন, হে সুলতান, আপনার মহানুভবতার কাছে আমি পরাজিত। পৃথিবীর কোনো শক্তি আপনাদের হারাতে পারবেনা। আমার আর যুদ্ধ করার দরকার নেই। আপনার মতো মহান হৃদয়ের সুলতানের কাছে পরাজয় মেনে নেওয়াকে গর্বের বিষয় মনে করছি। আজ আমরা পরস্পরের বন্ধু। আসুন বন্ধুত্বের এই বার্তা আমরা দুই দেশের জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিই।

ভোর হয়ে এসেছে। এবার বিদায়ের পালা। মহান সুলতান একটু একটু করে বেরিয়ে গেলেন শিবির থেকে।

রাজা দেখলেন মরুর পথ বেয়ে ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছেন মুসলিম জাহানের সুলতান। অব্যক্ত অনেক কথা জমে রইল বুকের মধ্যে। আর নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না। গাল বেয়ে চোখের

পরবর্তী অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

‘‘ফারুদ্দুহু ইলাল্লাহ্ অর্ রাসূল’’
(মত বিরোধের বিষয় আল্লাহ্ ও রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও)

অধ্যাপক মোহাম্মদ মোহসিন আনজুম

দ্বীন ইসলামের কোনো গুরুত্বপূর্ণ আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে নিখুঁত-নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য কুরআন এবং হাদীস — দুটোরই সুগভীর অধ্যয়ন অত্যাবশ্যক। নতুবা বিভ্রান্তি যে অপ্রতিরোধ্য সেকথা শত-সহস্র উদাহরণ সহযোগে প্রমাণ করা যায়। উল্লেখ্য যে, এজন্যই কুরআনুল কারীমের পাতায় পাতায় একসঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে ‘‘আতীউল্লাহ্ অ-আতীউর রাসূল’’ (সূরাহ্ নিসা. ৪/৫৯)। অর্থাৎ ‘তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য করো এবং রসূলেরও আনুগত্য করো।’ রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাঁর জীবনের সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভাষণেও অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেছিলেন — ‘‘আমি তোমাদের মাঝে দুটো জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি, যতদিন পর্যন্ত তোমরা সে দুটোকে আঁকড়ে ধরে থাকবে ততদিন পর্যন্ত তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। তা হল, আল্লাহ্‌র কিতাব এবং আমার সুন্নাহ্ হাদীস’’ (মুআত্তা ইমাম মালিক, মিশকাত)।

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, কুরআন এবং হাদীস উভয়কে নিয়েই দ্বীন ইসলামের পরিপূর্ণতা। উভয় জ্ঞান বিদ্যারই সুসমন্বয় অত্যাবশ্যক। এজন্যই রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ‘‘তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম যে নিজে কুরআন শেখে এবং অপরকেও শেখায়’’ (বুখারী, মিশকাত)।

আল্লাহ্ তাআলাও সূরাহ্ আহযাব-এ ঘোষণা দিয়েছেন, ‘‘প্রকৃতপক্ষে তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রসূলের জীবনে অত্যুত্তম নমুনা বর্তমানে রয়েছে, যারা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি আশাবাদী ও খুব বেশিভাবে আল্লাহ্‌কে স্মরণকারী’’ (সূরাহ্ আহযাব/২১)।

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত কিন্তু মনোজ্ঞ আলোচনার ভিত্তিতে আমরা নিঃসংকোচে বলতে পারি যে, উম্মাতের যারা দিগ্‌দর্শক, ওলামায়ে দ্বীন, দ্বীনের কাণ্ডারী এবং মুফতী তাঁদেরকে কুরআন ও হাদীসের অত্যন্ত পাকা পোখতা জ্ঞান অর্জন করা ফরয। কেননা উম্মাতের সকলেই সমান জ্ঞান বিদ্যা হাসিল করার সৌভাগ্য পেতে পারেনা। একজন বক্তার অনেক শ্রোতা হয়। মহামান্য বক্তা অসংখ্য শ্রোতাকে লক্ষ্য করে যা কিছু বলেন, নিষ্ঠাবান শ্রোতার মনে ও মননে তার প্রভাব পড়ে অত্যধিক। মূলতঃ তিনি দলপতি ও কমান্ডারের ভূমিকা পালন করেন। তাঁর তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম বিদ্যা বুদ্ধির শ্রোতাবর্গ তাঁরই দিশা-নির্দেশের উপর অনেকাংশেই নির্ভরশীল। অতএব তাঁর জ্ঞান বিদ্যাগত যোগ্যতা ও দক্ষতা হওয়া চায় নিখুঁত ও নির্ভরশীল। নতুবা অত্যল্প জ্ঞান বিদ্যার অধিকারী শ্রোতাবৃন্দ বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট হতে বাধ্য। দ্বীন ইসলামের ‘উলিল আমর’দের সম্পর্কেও এ কথাগুলো সমানভাবেই প্রযোজ্য?

‘উলিল আম্র’ শব্দটি সূরাহ্ ‘নিসা’র ৫৯ নং আয়াতে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ব্যবহৃত হয়েছে। আদি-মধ্য-আধুনিক - সবযুগেরই প্রখ্যাত মুফাস্‌সিরগণ এর অর্থ বুঝিয়েছেন — ওলামায়ে দ্বীন, মুফতিয়ান ও ইসলামী শাসক-প্রশাসক শব্দ যোগে। অর্থাৎ যাঁরা ইসলাম ও উম্মাতের ব্যাপারে সামগ্রিক দায়িত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি। সকলেই ঐক্যমত পোষণ করেন যে, এই শ্রেণির বিশেষ দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গকে অত্যাবশ্যকভাবেই কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ হতেই হবে। কেননা তাঁরাই হচ্ছেন দ্বীন এবং উম্মাতের সদাজাগ্রত কাণ্ডারী। বিশেষতঃ যাঁরা ওলামায়ে দ্বীন, মাওলানা ও মুফতী — তাঁদেরকে তো কুরআন এবং হাদীস — উভয় বিদ্যাতেই এবং আমলের ক্ষেত্রেও অগ্রবর্তী হতেই হবে। কুরআনুল কারীমে আল্লাহ্ তাআলা বলেন — ‘‘.... বলো, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান মানুষ কি এক হতে পারে? আলো ও অন্ধকার কি এক-অভিন্ন জিনিস?’’ (১৩ঃ১৬)

বোঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ্ তাআলা দ্বীনের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত দায়িত্বশীল মানুষবর্গকে ‘চক্ষুষ্মান’ এবং ‘আলো’ এ-সকল দুর্লভ উপাধিতে ভূষিত করেছেন। বিশ্বপতি এক লা-শরীক আল্লাহ্ প্রদত্ত খাঁটি ‘গোল্ড মেডেল’, ‘বিশ্বরত্ন’ তথা ‘নোবেল পুরস্কার’ হতেও লক্ষ কোটি গুণ বেশি মূল্যবান। হায়! আমরা সে কথা বুঝবো তবেই তো! রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন, ‘‘..... অ ইন্নাল্ ওলামায়া ওয়ারিসাতুল আম্বিয়া ..... ’’ অর্থাৎ মিশকাত ও তিরমিযীতে কাসীর বিন ক্যায়স বর্ণিত এই সহীহ্ হাদীসটির অর্থ হলো , ওলামায়ে দ্বীন হচ্ছেন মহামান্য আম্বিয়াগণের ভাগ্যবান ওয়ারিস অর্থাৎ খুশনসীব উত্তরাধিকারী। এটাও যে কত বড় সম্মান, মর্তবা ও মর্যাদা, সে কথা আমরা কখনো নিবিষ্ট চিত্তে ভেবে দেখেছি কি? এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত আয়াতটি আমাদের সকলের জন্য বিশেষতঃ ‘উলিল আম্র’ হতে সদিচ্ছুক ওলামায়ে দ্বীনের জন্য অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য — ‘‘যে

ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য করবে, সে ব্যক্তি সেইসব লোকদের সঙ্গী হবে যাদের প্রতি আল্লাহ্ তাআলা বিশেষ নিয়ামত দান করেছেন। তারা হচ্ছে আম্বিয়া সিদ্দীক, শহীদ ও সৎ-সজ্জন ব্যক্তিবর্গ। তাদের পক্ষে এ সকল ব্যক্তি কতই না উত্তম সাথী" (৪:৬৯)।

প্রাসঙ্গিক কথা বাড়িয়ে আর লাভ নেই। জ্ঞানী বুদ্ধিমানকে ইঙ্গিত-ইশারাই যথেষ্ট। লক্ষণীয় যে, উপরোক্ত আয়াতটিতেও আল্লাহ্ এবং রসূলের আনুগত্যেরই কথা সমানভাবে উচ্চারিত হয়েছে। অর্থাৎ উভয়ক্ষেত্রেই দক্ষতার্জন তথা আশানুরূপ দক্ষতা যোগ্যতার ভিত্তিতেই ওলামায়ে দ্বীনকে দ্বীনের সহীহ মসলা-মাসায়েল ও ফতুয়া-ফারায়েজ জারি করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ-লজ্জার বিষয় যে, বিগত প্রায় বারোশ' বছর হতে এক্ষেত্রে একশ্রেণির বিপুল প্রভাবশালী ওলামায়ে দ্বীন উদাসীনতা ও বেপরোয়া মনোভাব প্রদর্শন করে চলায় উম্মাতে মুহাম্মাদী কালক্রমে টুকরো টুকরো হয়ে চলেছে। এখনো হচ্ছে। ভবিষ্যতেও যে হবে , হতেই থাকবে, তারও স্পষ্ট নিদর্শন দেখা যাচ্ছে। বিভ্রান্ত শিয়া সম্প্রদায় এখন অন্ততঃ বারো উপদলে বিভক্ত, পীর-মুরিদ-মাযার গোষ্ঠীরা ভারত-বাংলাদেশ-পাকিস্তানে কুড়ি-পাঁচিশ উপদলে বিভক্ত, তাকলীদপন্থীরা অন্ততঃপক্ষে চার দলে তথা আহ্লে হাদীসরাও পরস্পরে নানা মনোভেদে লিপ্ত। আহমাদীয়াদের দাবি যে, 'আমরাই সর্বোত্তম মুসলিম।' বোহরা সম্প্রদায়ও ইসলামেরই দাবিদার। এসব ছাড়াও রয়েছে খারেজী, ফারেজী, ফাসেকী, মুনাফিকী মনোবৃত্তির দল-উপদল, যারা ওপরে-ভেতরে সকলেই মুসলিমরূপে পরিচিত হওয়ার পক্ষধর। সমস্ত দলাদলি ও ভাঙাভাঙির মূলে যে একশ্রেণির আত্মপূজারী স্বার্থপর 'নামকাওয়াস্তে ওলামায়ের দ্বীনের গভীর ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত নিঃশব্দে কাজ করে চলেছে তাতে সন্দেহ নেই। মূলতঃ সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ তাআলা উম্মাতকে নেতৃত্বদানকারী 'উলিল আম্র'কে অনেক কিছু অধিকার ও সম্মান দিয়েও সবকিছুই তাঁদের হাতে সমর্পণ করেননি। সূরাহ্ নিসার ৫৯ নং আয়াতে আল্লাহ্ তাআলার সেই ফরমান দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ফুটে উঠেছে —

"হে ঈমানদারগণ! আনুগত্য করো আল্লাহ্‌র, আনুগত্য করো রসূলের এবং সেইসব লোকদেরও যারা তোমাদের মধ্যে ওলামায়ে দ্বীন - সামগ্রিক দায়িত্ব সম্পন্ন। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যদি কোনো ব্যাপারে মতবৈষম্য সৃষ্টি হয়, তবে তাকে আল্লাহ্ ও রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও - যদি তোমরা প্রকৃতই আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাকো। এটাই হচ্ছে সঠিক কর্মনীতি ও পরিণামের দৃষ্টিতে উত্তম।"

সূরাহ্ মায়েদার ৬২-৬৩ এবং সূরাহ্ আরাফ-এর ১৭৫-১৭৬ নং আয়াতে আলোকে সম্মানীয় মুফাস্‌সিরগণ দিয়েছেন যে, পূর্ব ইহুদী-নাসারা-কওমের আলেমদের মতন উম্মাতে মুহাম্মাদীর কোনো কোনো দুনিয়াখোর আলীমও আল্লাহ্ ও রসূলকে বাদ দিয়ে কথা বলবে। নিজেরা তো বিভ্রান্ত হবেই, উম্মাতের অজ্ঞ-অনভিজ্ঞ নর-নারীদেরও পথভ্রষ্ট করে ছাড়বে। আলেমে আলেমে গভীর মতভেদ ও মনোভেদ সৃষ্টি হবে, আর এজন্যই সাধারণ জনতাকে এবং প্রকৃত ওলামায়ে দ্বীনকে আল্লাহ্ তাআলার স্পষ্ট ঘোষণা, "তোমরা যদি সত্য-সত্যই আল্লাহ্ এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হও, তবে মতভেদ ও মনোভেদের সঠিক মীমাংসার জন্য অবশ্যই ফিরে আসবে পবিত্র কুরআন এবং সহীহ্ হাদীসের দিকে। আর এটাই হবে খাঁটি মুসলিমদের জন্য সঠিক কর্মনীতি।"

ইসলামের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, একশ্রেণির দুনিয়া পূজারী আলেম পবিত্র কুরআনের ভুল ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে এবং প্রিয় নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর হাদীসকে বিকৃত করতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি। এক্ষেত্রে সম্ভবতঃ শিয়া সম্প্রদায় এবং আহমাদীয়ারা সর্বাধিক অগ্রবর্তী। খুলাফায়ে রাশেদার যুগে ফাসিক-ফাজির ও মুনাফিক মুসলিমরা কয়েক হাজার জাল ও যঈফ হাদীস রচনা করেছিল, যার দুষ্পরিণাম গোটা উম্মাত শুরু কাল হতেই মারাত্মকভাবে ভুগে চলেছে। আমাদের ব্রেলেবী ভাইরা 'ওয়াসীলা' শব্দের ভুল ব্যাখ্যায় প্রভাবিত হয়ে শির্ক সমতুল্য পীর-মাযার, নিয়াজ- ফাতিহা ইত্যাদি অপকর্মে জন-জীবন ভাসিয়ে দিয়েছেন। জাল এবং যঈফ হাদীসের ভিত্তিতেই সাড়ম্বরে পালিত হচ্ছে শবে বরাত এবং মুহার্‌রমে নিষিদ্ধ পটকা বাজি ও গানবাজনা। সবেরই মূলে যে নিহিত রয়েছে প্রবৃত্তি পূজক আলেমদেরই মনগড়া ফতুয়াবাজী তাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। এজন্যই আল্লাহ্ তাআলার স্পষ্ট ঘোষণা যে, মতভেদ, মনোভেদ ও মত বৈষম্যের ক্ষেত্রে তোমরা ফিরে চলো আল্লাহ্ এবং তদীয় রসূলেরই প্রদর্শিত পথ - পন্থার দিকে।

উপরোক্ত বিষয়টিকে আল্লাহ্ তাআলা আরও সহজবোধ্য ও গ্রহণযোগ্য করার জন্য সূরাহ্ হাশর-এ একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ আয়াত অবতীর্ণ করেছেন এই ভাষায় " অমা আতাকুমুর রাসূলো ফাখোজুহো ....".

অর্থাৎ "রসূল তোমাদেরকে যা কিছু দান করেন তা তোমরা

গ্রহণ করো, আর যে জিনিস হতে তিনি তোমাদেরকে বিরত রাখেন, তা হতে তোমরা ক্ষান্ত হয়ে যাও। আল্লাহ্‌কে ভয় করো, আল্লাহ্ কঠিন শাস্তি দাতা'' (৫৯/৭)।

সম্ভবতঃ অতঃপর প্রকৃত দ্বীন ও দ্বীনদারীর পরিচয় ও পহচান নিয়ে উলিল আম্‌রদের মধ্যে দলাদলি ও মন কষাকষির কোনো দরকার ছিলো না, কেননা প্রিয় নাবীর যাবতীয় কথা-কাজ ও জীবনাদর্শ আল্লাহ্‌র কালামেরই ব্যবহারিক প্রতিরূপ। কিন্তু সেই যে আত্মপূজা, যে সম্পর্কে আল্লাহ্ প্রিয় রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইলি ও সাল্লাম) কেও এই বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন —

''তুমি কি কখনো সেই ব্যক্তির অবস্থা চিন্তা করেছো, যে ব্যক্তি নিজ মনের লালসা-বাসনাকে আপন প্রভু বানিয়ে নিয়েছে? এমন মানুষকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব কি তুমি নিতে পারো?'' (২৫/৪৩)।

এই শ্রেণির মানুযে ও আলীমে এখন দুনিয়া ভরে উঠেছে। সুতরাং এদের জালসাদি হতে আত্মরক্ষা করাই হচ্ছে মুক্তিলাভের উপায়। উপরন্তু আল্লাহ্‌র কুরআনের প্রতি ও নাবীজির বিশুদ্ধ হাদীসের প্রতি প্রাণপণ মনোনিবেশ করাই পূর্ণ মুক্তিলাভের একমাত্র নির্ভরশীল অবলম্বন। সহীহ্ হাদীসরূপে আমাদের সম্মুখে বুখারী ও মুসলিম শরীফ তো আগে থেকে মওজুদ রয়েছেই, আল্লাহ্‌র আরও কিছু সত্যান্বেষী বান্দাহ্ এক্ষেত্রে বিস্ময়কর বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা এবং কঠোর পরিশ্রমের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। মুসলিম সর্বসাধারণের কর্তব্য হচ্ছে সুনির্ভরযোগ্য তাফসীর-তর্জমা এবং সহীহ্ হাদীসের সংকলন গ্রন্থগুলোর সুগভীর অধ্যয়ন। আমাদের মাতৃভাষাতেও এখন অনেক কিছুই হাতের কাছেই মতজুদ রয়েছে। প্রয়োজন কেবল আমাদের ব্যক্তিগত জিজ্ঞাসা এবং জিগীষার। আর আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা আকাঙ্খা এক্ষেত্রে দুর্বার হয়ে উঠবেনা কেন? আল্লাহ্ তো তাঁর সাফ কথা এ ভাষায় পরিষ্কার করে দিয়েছেন —''হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা নিজেদেরই কথা চিন্তা করো, অন্য কারো পথভ্রষ্ট হওয়ায় তোমাদের কোনো ক্ষতি হবে না, যদি তোমরা নিজেরা সঠিক পথের পথিক হয়ে থাকতে পারো। তোমাদের সকলকেই আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তোমাদের জানিয়ে দেবেন যে তোমরা (দুনিয়ার জীবনে) কে কি কাজ করছিলে'' ৫/১০৫)।

সহীহ্ জ্ঞানালোকের ভিত্তিতেই যে আমাদের সকলকেই আল্লাহ্ ও রসূলের দিকে ফিরে আসতে হবে, এটাই হচ্ছে সব কথার শেষ কথা। এরই নাম কুরআনের সূরাহ্ হুদ-এর ১১২ নং আয়াতে উচ্চারিত 'ফাস্তাকিম' — অর্থাৎ আল্লাহ্ ও রসূলের পথকে একটুও উপেক্ষা না করে অটল-অবিচলভাবে 'সিরাতিম মুস্তাকীম' এর ওপর দাঁড়িয়ে থাকা। এ প্রসঙ্গে 'তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন'এর ৮৪৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে, ''দুনিয়ায় যতো গুমরাহী ও পাপাচার সবই ইস্তেকামাত হতে সরে যাওয়ার ফল। ইস্তেকামাত না থাকলে মানুষ বিদ্‌আত হতে শুরু করে শিরকী ও কুফরী পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আল্লাহ্ তাআলার তাওহীদ, পবিত্র সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) যে সুষ্ঠু ও সঠিক মূলনীতির শিক্ষা দিয়েছেন, তার মধ্যে বিন্দুমাত্রও হ্রাস-বৃদ্ধি অথবা পরিবর্দ্ধন-পরিমার্জন করলে বিভ্রান্তি অপ্রতিরোধ হয়ে পড়ে, নিয়্যাত যতই শুদ্ধ হোকনা কেন। .. এজন্যই রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) স্বীয় উম্মাতকে বিদআত ও নিত্য- নতুন সৃষ্ট প্রথা হতে অত্যন্ত জোরালো ভাষায় আত্মরক্ষার উপদেশ দিয়েছেন। বিদআতকে চরম গুমরাহী বলেছেন। প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য হলো, আল্লাহ্ ও রসূলের সন্তুষ্টিমূলক কাজগুলোকেও পূর্ণ তাহ্‌কীতের মাধ্যমে যথারীতি আঞ্জাম দেওয়া।''

উল্লেখ্য যে, সৎপন্থী ও সত্যপন্থী মুসলিমদের মধ্যেও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উদাসীনতা পরিলক্ষিত হয়। অকারণ জিদ, প্রভাব বিস্তারের দূরাকাঙ্খা এবং প্রতিপক্ষকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যও বহু উচ্চশিক্ষিত এ-হেন প্রবৃত্তিপূজায় জড়িয়ে পড়ে। পরম করুণাময় মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে সর্বাবস্থায় তাঁরই খাঁটি আনুগত্য এবং তাঁর প্রিয় রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর প্রকৃত ফর্মাবরদারী তাওফীক দান করুন — আমীন।

---

২৫ পৃষ্ঠার পর —

জল গড়িয়ে পড়ল। দূর মরুর দিকে তাকিয়ে অপরিসীম আবেগে হাত তুলে বলতে লাগলেন ঃ হে সুলতান, তুমি বীর, বিজয়ী বীর। তোমার বীরত্বে পৃথিবীর ইতিহাস হবে গৌরবান্বিত।

তারপর আকাশের দিকে মুখ করে বলতে লাগলেন ঃ হে ইশ্বর! তুমি আছো কিনা জানিনা। যদি থেকে থাকো, তাহলে মানবতার এই বন্ধুকে বসাও শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আর যুগে যুগে পৃথিবীর শান্তি শৃঙ্খলার জন্য সুলতান সালাউদ্দিনের মতো লোক পৃথিবীতে পাঠাও।

২য় পর্ব

আসল আহ্‌লুস সুন্নাহ্ কে?

মূল ঃ ফাযীলাতুশ্ শায়খ হাফিয আব্দুল্লাহ, ভাগলপুর
অনুবাদক ঃ মুসলেহুদ্দীন মাযহারী

মুহাম্মাদী ঃ আহ্‌লুস সুন্নাহ্‌র সংজ্ঞা অনুযায়ী কোনো ইমামের তাক্বলীদ করা মোটেও অন্তর্ভুক্ত নয়। আহ্‌লুস সুন্নাহ্ তাঁকেই বলা হয় যিনি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সুন্নাতের উপর চলবেন।

আর হানাফী তাকেই বলা হয় যিনি ইমাম আবু হানীফার তাক্বলীদ করেন ও ফিক্বহে হানাফীর উপর চলবেন।

এখন দুটোকে অর্থাৎ হানাফী এবং আহ্‌লুস সুন্নাহ্‌কে এক প্রমাণ করতে হবে, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সুন্নাত ও ফিক্বহে হানাফীকে একই প্রমাণ করা আবশ্যিক, যা একেবারেই অসম্ভব। যখন রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সুন্নাত ও ফিক্‌হে হানাফী এক প্রমাণ পাওয়া সম্ভব নয়, তখন আহ্‌লুস সুন্নাহ্ ও হানাফী একই এটা সাব্যস্ত করা অসম্ভব। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকাটা স্বাভাবিক।

হানাফী ঃ আমি জানি কিন্তু পার্থক্যটা কোনো ব্যাপার নয়।

মুহাম্মাদী ঃ পার্থক্য তো আহ্‌লুস সুন্নাহ্ ও আহ্‌লুল হাদীসে নেই, দুটোই এক। কেননা সুন্নাতও রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর এবং হাদীসও রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর। হানাফী ও আহ্‌লুস সুন্নাহ্‌তে তো বিস্তর পার্থক্য বা বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান।

হানাফী ঃ কী পার্থক্য রয়েছে?

মুহাম্মাদী ঃ এটাই যে, হানাফিয়্যাত উম্মতের দ্বারা তৈরিকৃত আর সুন্নাত হল নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর। যা পার্থক্য নাবী এবং উম্মাতের সেই পার্থক্যই রয়েছে হানাফী এবং আহ্‌লুস্ সুন্নাহ্‌র মধ্যে। হানাফী বেরেলভী যে আহ্‌লুস সুন্নাহ্ হিসাবে প্রসিদ্ধ ওটা শুধুমাত্র শিয়াদের কারণে। কেননা শিয়াদের বিপরীতে সকলেই আহ্‌লুস সুন্নাহ্। বেরেলভীদের সংখ্যাধিক্যের কারণে এই নামে তারা বেশি প্রসিদ্ধ। কিন্তু শিয়াদের বলাতে বেরেলভী আহ্‌লুস সুন্নাহ্ হতে পারে না। যেমন হিন্দু ও ইংরেজদের বলাতে কাদীয়ানী মুসলিম হতে পারে না। কোন্ জিনিস কি! এটা জানার জন্য তার বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে হয়।

হানাফী ঃ বেরেলভী শুধু শিয়াদের বলাতে হয়, তারাও নিজেদের দাবি অনুযায়ী আহ্‌লুস সুন্নাহ্।

মুহাম্মাদী ঃ এই দাবি জোরপূর্বক, শুধু দাবীতে কী হবে? যদি কেউ বেরেলভীর দিকে মুখ করে আর কিবলাকে কাবা বলে, কুফার রাস্তায় যাবে আর দাবি করবে মদীনার। তাকে কে সত্যাবাদী বলবে। জোরপূর্বক দাবি তো কাদিয়ানীরাও করে। তবে কি তারা তাদের দাবী অনুযায়ী কাদিয়ানী থেকেও মুসলিম হতে পারে?

হানাফী ঃ আপনারাও তো নিজেকে আহ্‌লুস সুন্নাহ্ বলে দাবি করেছেন।

মুহাম্মাদী ঃ দাবি নয় প্রকৃতই আহ্‌লুস সুন্নাহ্। কারণ আমরা শুধুমাত্র নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এরই অনুসরণ করি এবং তাঁকেই আমরা পথ প্রদর্শক ও ইমাম বলে মানি। তাঁর দিকে ছাড়া কারো দিকে আমরা নিজেদের সম্বোধন করিনা। আমরাও আহ্‌লুস সুন্নাহ্ হতাম না যদি আপনাদের মতো কোনো ইমামের মুকাল্লিদ হতাম।

হানাফী ঃ আপনাদেরকে তো ওহাবী বলে।

মুহাম্মাদী ঃ ওহাবী তো আপনারা বানাচ্ছেন নতুবা আমরা ওহাবী কোথায়?

হানাফী ঃ আমাদের কী প্রয়োজন আপনাদের ওহাবী বানানোর।

মুহাম্মাদী ঃ যাতে একই স্নানাগারে সকলেই নগ্ন হতে পারেন। সকলেই যেহেতু মুকাল্লিদ কেউ কাউকে বিদ্রুপ বা উপহাস না করতে পারেন।

হানাফী ঃ মুকাল্লিদ হওয়াটাও কী উপহাসের বিষয়?

মুহাম্মাদী ঃ অবশ্যই! যদি কেই বুঝে তো।

হানাফী ঃ উপহাস কীভাবে?

মুহাম্মাদী ঃ মুকাল্লিদ তো মানুষকে জন্তু বলারই নামান্তর। কেননা তাক্বলীদ বলা হয় জন্তুর গলায় পট্টি পড়ানোকে। এটা জানোয়ারের জন্য প্রযোজ্য। এ কারণেই আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এই শব্দটি মানুষের জন্য ব্যবহার করেননি, বরং কুরআন ও হাদীসে এই শব্দটি শুধুমাত্র জানোয়ারের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে।

হানাফী ঃ আপনারা কি কারোই তাক্বলীদ করেন না?

মুহাম্মাদী ঃ তাক্বলীদ যখন জানোয়ারের জন্য, মানুষের জন্য নয় তখন আমরা কেন কারো তাক্বলীদ করবো?

হানাফী ঃ শুনেছি যে, তাক্বলীদ ছাড়া কোনো গতি নেই,

তাক্বলীদ তো যে কেউ করে। তাক্বলীদ তো আপনারাও করেন বাবা-মায়ের ও শিক্ষকদের।

মুহাম্মাদী ঃ এর নামই যদি তাক্বলীদ হয় আর আমরা সেটা করি তবে আপনারা কেন আমাদের গায়ের মুকাল্লিদ বলেন? যদি পিতা-মাতা ও শিক্ষকের কথা মানা তাক্বলীদ হয় তবে আপনারা আপনাদের ইমামকে কেন মুকাল্লিদ বলেন না?

হানাফী ঃ আপনারা কি নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এরও তাক্বলীদ করেন না?

মুহাম্মাদী ঃ নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) যখন তাক্বলীদ করতেই বলেননি তো তাঁর তাক্বলীদ কীভাবে ও কেন করবো?

১১পৃষ্ঠার পর —

২। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন —

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلٰى سَبْعَةٍ وَ لَا أَكُفَّ شَعْرًا وَ لَا ثَوْبًا.

আমাকে সাতটি হাড়ের উপর সাজদা করার আদেশ করা হয়েছে এবং আরো আদেশ করা হয়েছে যে, যেন চুল এবং কাপড় না গুটায়।[১]

ইমাম ইবনু খুযাইমা (রহঃ) এ হাদীসের জন্য 'বাবুয্ যাজরে আন্ কুফ্‌ফিস্ সিয়াবে ফিস্ স্বলাত' অর্থাৎ স্বলাতে কাপড় গুড়িয়ে রাখার জন্য তিরস্কারের বর্ণনা নামক অধ্যায় রচনা করেছেন।[২]

(নওয়াবী রহঃ) — এই সতর্কতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে বলেন — فَلَا خَيْرَ فِيْهِ এতে (কাপড় গুটিয়ে রাখাতো) কোনো মঙ্গল নেই।[৩]

তিনি আরো বলেন, এ নিষেধাজ্ঞা সত্বেও যদি কেউ এ অবস্থাতেই স্বলাত আদায় করে, তাহলে তাঁর স্বলাত তো হয়ে যাবে, কিন্তু সে মন্দ কাজ করবে।[৪]

১। মুসলিম ৪৯০, কিতাবুস্ স্বলাত ঃ বাবু আযাইস্ সুজুদ, অন নাহী আন্ কুফ্‌ফিস শা'রে অস্ সওবে অ আকসির রাস ফিস্ স্বলাত, নাসায়ী ২/২১৫, ইবনু মাজাহ্ ১০৪০, ইবনু খুযাইমা ৭৮২।

২। সহীহ্ ইবনু খুযাইমা ১/৩৮৩।

৩। কামা ফিল মুদাত্ওয়ানাতিল কুবরা ১/৯৬।

৪। শারহু মুসলিম ৪/২০৯।

৬ষ্ঠ পর্ব

দূর আরবের স্বপ্ন

মোহাম্মদ জাকারিয়া

পয়গম্বরীর সূচনায় নাবীজীর জীবন ছিল এলোমেলো শৃঙ্খলা বিহীন। নাবী জীবনের প্রথম অধ্যায়ে যখন আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে দৌদুল্যমান; তখন বিবি খাদিজাই ছিল আদর্শ সহধর্মিনীরূপে নাবীজীর সান্ত্বনা, প্রেরণা ও বল-ভরসা। এহেন জীবন সঙ্গিনী চির বিদায় নিলে নাবী হতে। অর্ধ-শতাব্দীর লালন-পালন ও রক্ষণা-বেক্ষণকারী, হিতাকাঙ্খী চাচা আবু তালেবের শোক ভুলতে না ভুলতে এই মহা শোকের আঘাত লাগল নাবী-জীবনে।

মক্কার দুর্বত্ত শত্রুরা দেখল তাদের অত্যাচার করার পথ নিষ্কন্টক। এতদিন আবু তালেবের জন্য বিশেষ কিছু করতে পারত না। এখন সে বাধাও আর নাই। তাই এহেন নাবীজির প্রতি অত্যাচার ও নির্যাতন চালাতে কোরেশরা দ্বিগুণ উৎসাহে মেতে উঠল। মনের ক্ষোভ উজাড় করে তারা নাবীজিকে উৎপীড়িত করতে আরম্ভ করল।

নাবীজির গৃহাভ্যন্তরে রান্নার পাত্রে দুর্বৃত্তরা ময়লা গলিজ পচা-আবর্জনা ফেলতে লাগল। আল্লাহ্‌র ঘরের নিকট স্বলাত পড়ার সময় উটের ভুঁড়ি চাপিয়ে দিল। গলার চাদরে ফাঁস লাগিয়ে শ্বাস রুদ্ধ করে মারার চেষ্টা করল। এছাড়া আবু জেহেল তাকে প্রাণে মারার জন্য কসম করল।

এতগুলো বিপদের একত্র সমাবেশ, অপরদিকে নবুঅতের দায়িত্ব। ইসলাম প্রচার কার্যের অলঙ্ঘনীয় আদেশ। এই রকম চরম সংকটের সম্মুখীন হয়ে ও নাবীজি এক বিন্দু বিচলিত হলেন না। তাঁর ধ্যান-জ্ঞান এখন আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রচার। ধীর স্থির চিত্তে বিকল্প পন্থার চিন্তা করলেন। অনেক ভেবে চিন্তে বাল্যের লীলাভূমি তায়েফ যেতে মনস্থ করলেন। দুধ মা হালিমার স্নেহ ও দুধ বোন সায়মার সেবা যত্নের ভূমি তাকে প্রলুব্ধ করল।

সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা। ব্যবসা বাণিজ্যে মক্কাবাসীদের সঙ্গে তায়েফবাসীদের পরিচয়ও ছিল। বৈবাহিক আদান-প্রদানও ছিল। কাবা শরীফ তায়েফবাসীদের তীর্থস্থান ও ছিল। অনেক কুরাইশ প্রধানের তায়েফে বাগ-বাগিচাও ছিল। তাই এই

তায়েফকেই নাবীজি নিজ কর্ম স্থল ও ইসলামের প্রচার কেন্দ্র বানাবার পরিকল্পনা করলেন।

উম্মুল মুমিনীন সওদা যিনি বেশি বয়সের ছিলেন এবং সংসার পরিচালনার অভিজ্ঞতা সম্পন্নও ছিলেন। তাকে বিবাহ করে নিজের ঘরের শৃঙ্খলা আনার ব্যবস্থা করলেন। আর বিবাহিত ও অবিবাহিত ৪ কন্যার জন্য গৃহ সামলানোর ব্যবস্থা করে নাবীজী তায়েফ গমনের ব্যবস্থা সম্পন্ন করলেন।

নাবীজি তায়েফের পথে যাত্রা করলেন। সঙ্গে একমাত্র সঙ্গী তার প্রিয় ভক্ত অনুরক্ত পালিত পুত্র জায়েদ। দুর্গম গিরি কান্তার মরু পার হয়ে নাবীজি জায়েদ সহ তায়েফ নগরে প্রবেশ করলেন। তার দীর্ঘ ৭০/৮০ মাইল পথ পদব্রজে অতিক্রম করলেন (যারকানী ১/৩০৫ পৃঃ)।

তৎকালীন দিনে তায়েফ অঞ্চলে যে সমস্ত গোত্র বাস করত বনী সকিফ গোত্র তন্মধ্যে প্রধান। সেই গোত্রের আবেদ যলীল, হাবিব ও মসউদ এই ভ্রাতা ত্রয় সর্দার বা সমাজপতি ছিলেন। নাবীজি সর্বপ্রথম এখানেই গমন করলেন এবং প্রধানগণের নিকট উপস্থিত হয়ে তাদেরকে আল্লাহ্‌র পানে আহ্বান করলেন এবং সত্যের প্রচারে কুরাইশদের বাধা দানের ঘটনা ব্যক্ত করে তাদেরকে সত্যের সহায়তা করতে অনুরোধ জানালেন।

তায়েফের অধিবাসীরাও কোরেশদের ন্যায় পৌত্তলিক ছিল। তারা ছিল শস্য-শ্যামল তায়েফের অর্থ সম্পদের অধিকারী। সেই অহংকার ও গর্বও ছিল তাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করল. ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে বলল আল্লাহ্ বুঝি খুঁজে খুঁজে আর লোক পেল না, তোমাকেই পয়গম্বর করল।

নাবীজি উপস্থিত নেতাদের আশা ত্যাগ করলেন। অবশেষে নাবীজি তাদেরকে অনুরোধ করলেন, তারা যেন নাবীজি সম্বন্ধে তাদের মনোভাব গোপন রাখে। তিনি ভাবলেন তারা যদি এই বিষাক্ত মনোভাব প্রচার করে বেড়ায় তবে জন সাধারণের মধ্যে সত্যের প্রচার দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে। তাদের মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হবে। ফলে তায়েফের অবস্থাও মক্কার ন্যায় হয়ে উঠবে। নাবীজি এবং ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়বে। শকীফ প্রধানগণ নাবীজির এই অনুরোধও রক্ষ করল না। তারা তায়েফের দুষ্ট দুরাচার লোকদেরকে লেলিয়ে দিল। দেশবাসীকে নাবীজির বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলল। এমনকী তাদের চাকর ও দাসদাসীগণকেও পেছনে লাগিয়ে দিল। এখন নাবীজি কোথাও বের হলে ঐ সব লোকেরা হৈ হৈ করে চার দিকে সমবেত হতে থাকে। পথ চলতে লাগলে পেছনে পেছনে পাথর বর্ষণ ও গালি গালাজ করতে থাকে। তার দেহ মুবারক রক্তাক্ত করে ফেলে। অনেক সময় দুর্বৃত্তরা রাস্তার ধারে বসে থাকত আর কোমল চরণ দ্বয় রক্তাক্ত হয়ে যেত। এমনকী পায়ের রক্ত শুকিয়ে জুতোর গায়ে আটকে লেগে যেত।

অসহনীয় প্রস্তরাঘাতে নাবীজি কখনো কখনো অবসন্ন হয় পড়তেন। পাষণ্ডরা দুই বাহু ধরে তুলে দিত। আবার চলতে লাগলে পাথর বর্ষণ করত। আর নরাধমদের হৈ হৈ হাস্য রোলে রাস্তা মুখরিত হয়ে উঠত। তিনি যে দুঃখ-কষ্ট নির্যাতন ভোগ করেছিলেন তা অসহনীয়।

নাবীজির সঙ্গী অনুরক্ত ভক্ত, পালিত পুত্র জায়েদ নিজ জান প্রাণ দিয়ে নাবীজিকে রক্ষা করার বিষয়ে নিশ্চিত করছিলেন। তিনি এই পরিস্থিতিতে একা কি করতে পারেন। তিনিও মাথায় ভীষণভাবে আঘাত পেয়েছিলেন।

খাওয়া নেই দাওয়া নেই। উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়ানো। সেই সঙ্গে আঘাতের পর আঘাতে ক্রমশঃ অবসন্ন ও অচৈতন্য হয়ে পড়তে লাগলেন। এ দিকে পাষণ্ডদের অত্যাচার কঠিন হতে কঠিনতর হতে লাগল। এমতাবস্থায় একদিন পথি পার্শ্বে একটি বাগানের নিকট পৌঁছালেন। বাগানটা ছিল মক্কার দুই ভ্রাতা ওতবা ও শয়বার। দুজনেই বাগানে উপস্থিত ছিলেন। নাবীজি ও ঐ বাগানে আঙ্গুর গাছের ছায়া আশ্রয় নিলেন। আমরা ও পায়ে পায়ে এক সময়ে সস্ত্রীক হাজির হয়েছিলাম ঐ পাঁচিল ঘেরা বাগানে। ওতবা শয়বার বাগানে। গুটি কয়েক গাছ বর্তমানে সেখানে। তারাই যেন বুকে ধরে রেখেছে আজও সেই কাহিনী।

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেছেন — আমি একদা নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করলাম - ওহুদ রণাঙ্গণের অবস্থা অপেক্ষা কঠিন অবস্থা আপনার জীবনে আর উপস্থিত হয়েছে কি? উত্তরে তায়েফবাসীদের নির্যাতনে, সর্বাধিক দুঃখ কষ্ট পাবার কথা, উল্লেখ পূর্বক তাদের অত্যাচারের লোম হর্ষক কাহিনী তুলে ধরলেন (বুখারী ১৫১৪)

তায়েফে মাত্আমে বুখারী হোটেলে খাওয়া দাওয়া করলাম। একই দস্তরখানে খাওয়ার সিস্টেম। সারাদিন শেষে এশার আগে মক্কার হোটেলে ফিরে এলাম।

শেষ পর্ব

আলেমগণ যখন দিগ্‌ভ্রান্ত

মুহাম্মাদ ইসমাঈল

কোন আলেম যখন স্বার্থান্বেষী ঃ দুনিয়াটা স্বার্থের। স্বার্থহীন লোক পৃথিবীতে কটা আছে? নিজ-নিজ স্বার্থ হাসিলের জন্য আমরা সবাই অতি তৎপর। পৃথিবীতে টিকে থাকার জন্য এর প্রয়োজন অবশ্যই আছে। কিন্তু তার ও একটা সীমা আছে নিশ্চয়ই। আল্লাহ্ জাল্লা শানাহু প্রতিটি বিষয়ের সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর বলে দিয়েছেন সেই সীমা লংঘন না করতে। যথা —

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ.

আর যে কেউ আল্লাহ্ ও তদীয় রসূলের অবাধ্য হবে এবং তাহার নির্ধারিত সীমা লংঘন করবে, তিনি তাকে নরকাগ্নিতে প্রবেশ করাবেন। সেখানে সে চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে এবং তার জন্য রয়েছে অপমানকর শাস্তি (সূরাহ্ নিসা/১৪)।

আল্লাহ্‌র কালাম তো রয়েছে যথাস্থানেই। কিন্তু আমরা চলেছি নিজ খেয়াল-খুশি মত। সাধারণ ব্যক্তির কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু যখন একজন আলেমে দ্বীন আল্লাহ্‌র কালামকে অবজ্ঞা করেন, তখন নিজেকে পরিতাপের বিষ বাষ্পে দগ্ধিভূত হতে হয়।

ধরুন, বিশিষ্ট কোন আলেম হয়ত বা তিনি শাইখুল হাদীসও। তিনি যদি প্রকাশ্য জনসভায় এমন বক্তব্য পেশ করেন, যা মূলতঃ সহীহ্ সুন্নাহ্ বিরোধী। যেমন কোনো মুসল্লী স্বলাতে বুকে হাত বাঁধতে পারে, আবার বুকের নীচে অথবা নাভীর নীচেও হাত বাঁধতে পারে। তবে কিছু যায় আসেনা। মুক্তাদীরা স্বলাতে সূরাহ্ ফাতিহা পড়তে পারে নাও পড়তে পারে। জেহরী স্বলাতে সূরাহ্ ফাতিহার শেষে 'আমীন' উচ্চস্বরে ও বলা যাবে, নিম্নস্বরেও বলা যাবে। স্বলাত শেষে (ইমামের সালাম ফেরানোর পর) মুক্তাদীদের নিয়ে ইমামকে দুহাত তুলে ইজ্‌তেমায়ী দুআ (মুনাজাত) করতে হবে। ফিৎরার (যাকাতুল ফিত্‌র) ক্ষেত্রে ধান ফিৎরা হিসাবে, আদায়ে দিতে হবে। (এই বিষয়ে পুস্তকও রচনা করা হয়েছে)। মাইয়েত দাফন করার পর ইজতেমায়ী ভাবে হাত তুলে দুআ করতে হবে। বিবাহের খুত্‌বা শেষে দুহাত তুলে ইজ্‌তেমায়ী দুআ করতে হবে।

এমনিতরো অনেক মাসয়ালা, যা তারা ভরা মজলিসে পেশ করছেন। বলুন তো আম জনসাধারণ এক্ষেত্রে কি করবেন? তাদের তো এমন ইলম নেই যে, যা দিয়ে তাঁরা ঐসব বিষয় যাচাই বাছাই করবেন। ফলে তাঁরা সেই উপদেশ মত আমল করে চলেছেন। এর দ্বারা তাঁরা কি সঠিক দ্বীনের সঠিক দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন, না আর কিছু? জানিনা, কোনো স্বার্থে তাঁরা এমন জঘন্য নিন্দনীয় অপকর্ম করে চলেছেন? হয়ত বা নিজের ইমেজ বহাল রাখার জন্য কিংবা নিজ অনুরাগীদের আয়ত্তে রাখার জন্য অথবা নিজেদের দল ভারী করার জন্য (আল্লাহ্ ভাল জানেন)।

উম্মাতে মুসলিমা এক আবদ্ধ জাতি, আল্লাহ্ তাআলা সমস্ত মুসলিমকে ঐক্যবন্ধ হয়ে থাকতে বলেছেন। তিনি তাঁর কালাম মাজীদে দ্ব্যর্থহীনভাবে নির্দেশ দিচ্ছেন এই বলে —

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّ لَا تَفَرَّقُوْا.

তোমরা সম্মিলিতভাবে দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না (আল্ ইমরাণ ১০৩)।

কিন্তু মজার ব্যাপার হল এই যে, মুসলিম জাতি আজ শতধা বিভক্ত। একগোষ্ঠী আর একগোষ্ঠীর প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন। সামান্য ক্ষমতা বা পদের লোভে নিজেদের মধ্যেই দল ভাগাভাগি। সাধারণ লোকের কথা বলছি না। বলছি আলেমদের কথাই। ধরুন, কোনো জামাআতের আমীর নির্বাচন। সেখানেও আলেমগণের মাঝে শুরু হয়ে যায় লুকোচুরি, রেষারেষি। হয়ত বা আমীর পদের কিছু মর্যাদা কিছু সম্মান আছে। আর্থিক কোনো উন্নতি বা অবনতি তো তেমন কিছু নেই। তা সত্ত্বেও ঐ পদকে কেন্দ্র করে এক জামাআত ভেঙ্গে দুই বা তিন জামাআত হচ্ছে। বৃহৎ কোনো দেশের কথা নয়, পশ্চিমবঙ্গ, যা একটি ক্ষুদ্র প্রদেশ মাত্র; সেখানকার কথাই বলছি। জানিনা কোনো স্বার্থে এই দল ভাগাভাগি? আল্লাহ্‌র কালামের আলেমগণই যদি কোনো পরওয়া না করেন তবে সাধারণ লোক তা মানবে কেন?

এমনিতরো বহু বিষয় আছে। যথা মাদ্রাসা, মসজিদ, গ্রামের সর্দার ইত্যাদি, যেখানে সামান্য স্বার্থের লোভে আলেমগণ ফেঁসে আছেন। তাঁদের প্রতি অনুনয়, অনুরোধ, একটু বিবেকবান হোন! মুসলিম নামক সমাজটাকে অধঃপতনের অতল তলে নিয়ে যাবেন না।

কোনো আলেম যখন ইল্ম গোপনকারী ঃ মহান আল্লাহ্ যাকে ইল্ম (জ্ঞান) দান করেছেন, তাঁর মর্যাদাও বাড়িয়ে দিয়েছেন অজ্ঞদের উপর। আর ইল্ম এমনি একটি বিষয়, যা দান করলে তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পায়। যাঁরা জ্ঞানী, তাঁদের সার্থকতা জ্ঞান বিতরণেই। ইতিপূর্বে এতদ্ সংক্রান্ত কিছু হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। এ স্থলে যারা তা করেন না, অর্থাৎ ইল্ম গোপন করেন, তৎ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলার কী ফায়সালা তা অবলোকন করুন। আল্লাহ্ তাআলা ঘোষণা দিয়েছেন এই বলে —

وَ اِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَ لَا تَكْتُمُوْنَهٗ فَنَبَذُوْهُ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ.

(স্মরণ কর) যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল, আল্লাহ্ তাদের নিকট প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, তোমরা তা স্পষ্টভাবে মানুষের কাছে প্রকাশ করবে এবং তা গোপন করবেনা। এরপরও তা তারা পৃষ্ঠের পিছনে নিক্ষেপ করে (অর্থাৎ অগ্রাহ্য করে) এবং তা স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করে। সুতরাং তারা যা ক্রয় করে তা কত নিকৃষ্ট (সূরাহ্ আলে ইমরাণ / ১৮৭)।

এখানে 'আলেম সমাজকে জ্ঞাত ও সতর্ক করা হয়েছে যে, তাদের নিকট উপকারী যে জ্ঞান রয়েছে, যে জ্ঞান দ্বারা মানুষের যাবতীয় আক্বীদাহ্ ও আমলের সংশোধন হওয়া সম্ভব, সে জ্ঞান যেন তারা মানুষের নিকট অবশ্যই পৌঁছেদেন। পার্থিব স্বার্থ ও লোভের খাতিরে তা গোপন করা হবে অতি বড় অপরাধ। কিয়ামতের দিন এই ধরণের আলেমকে আগুনের লাগাম পরানো হবে (একথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে)' (তাফসীর আহ্সানুল বায়ান, উক্ত আয়াতের তাফসীর দেখুন)।

অপর আয়াত দেখুন —

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَ تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

তোমরা হককে বাতিলের সাথে মিশ্রিত কর না এবং জেনে বুঝে হককে গোপন করনা (সূরাহ্ বাক্বারাহ্/৪২)।

নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন, ''মিরাজের রাত্রে এমন একদল লোকদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছি, যারা আগুনের কাঁচি দ্বারা নিজেদের ঠোঁট কাট ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে জিবরীল ওরা কারা? তিনি বললেন, ওরা আপনার উম্মাতের বক্তা দল, যারা নিজেরা যা করত না (জানা সত্বেও) তা অপরকে বলে বেড়াত (আহমাদ ৩/১২০, ইবনে হিব্বান, সহীহ্ তারগীব ১২০)।

উল্লিখিত আয়াত ও আলোচ্য হাদীস দ্বারা জ্ঞাত হওয়া গেল যে, যে যা জানে, তাঁর উচিত অপরকে তা জানানো। যদি তা না করা হয়, তবে সে ইলম গোপনকারী হিসাবে সাব্যস্ত হবে। যা সমাজে অনেক আলেমের মধ্যে বিদ্যমান।

ধরুন, নেশা দ্রব্য পানের বিষয়টা, না আমি মদ পানের কথা বলছিনা। এটা কোনো আলেমের পক্ষে ভাবা যায় না। তবে সাধারণতঃ আলেমগণকে জর্দা দেওয়া পান খেতে ব্যাপক হারে দেখা যায়। অনুরূপ দেখা যায় খৈনী খেতে। বিড়ি-সিগারেট আস্বাদন করতেও দেখা যায় অনেক আলেমকে। দেখা যায় গুল-গুটখা ইত্যাদি ব্যবহার করতে।

এখন প্রশ্ন হল এসব বস্তু হালাল না হারাম? যারা এসব দ্রব্য ব্যবহার করেন, তাঁদের নিকট উক্ত বস্তুগুলি নিশ্চয়ই হালাল। না হলে তা ব্যবহার করেন কোন যুক্তিতে? কোনো কোনো আলেম সরাসরি হালাল না বলে মাক্রূহু বলে হারাম থেকে পৃথক করার কৌশল অবলম্বন করেন।

এবার বিষয়টা নিয়ে একটু পর্যালোচনা করা যাক। মহান আল্লাহ্ তাঁর নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে নির্দেশ দিচ্ছেন এই বলে —

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ.

তারা তোমাকে নেশাদার দ্রব্য ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল তাতে বড় গুনাহ হয় ..... (সূরাহ্ বাক্বারাহ্/২১৯, অনুরূপ আয়াত দেখুন সূরাহ্ মায়েদাহ্/৯০-১১)।

নাবী কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর হাদীস দেখুন — لَا تَشْرَبْ الْخَمْرَ فَاِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ

নেশা দ্রব্য পান করনা, নিশ্চয়ই তা সব ধরণের অন্যায়ের চাবী (ইবনু মাজাহ্ ৩৩৭১)।

অপর হাদীস — كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. সব ধরণের নেশাদার দ্রব্য হারাম (ইবনু মাজাহ্ ৩৩৮৮)।

অন্য হাদীসের বর্ণনা এসেছে —

مَا أَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ

যে বস্তু বেশি পরিমাণ খেলে নেশা হয়, তার কমও হারাম (ইবনু মাজাহ্ ৩৩৯৩)।

আর একটি হাদীস দেখুন — مَنْ أَكَلَ ثُوْمًا أَوْ بَصَلًا. যে ব্যক্তি রসুন বা পিঁয়াজ খায়, তার উচিত আমাদের থেকে দূরে থাকা অথবা আমাদের মসজিদ থেকে দূরে থাকা (বুখারী ৮৫৪, মুসলিম ৫৬২)।

উল্লিখিত কুরআনের আয়াত ও হাদীস কী প্রমাণ করে? জর্দা, খৈনী, বিড়ি, সিগারেট, গুল ইত্যাদি হারাম না হালাল। পিঁয়াজ - রসুন এর গন্ধের কারণে যদি মসজিদ যাওয়া নিষিদ্ধ হয়, তবে জর্দা, খৈনী ইত্যাদি খেয়ে তথায় যাওয়া কি বৈধ হবে? আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলছি। মসজিদে যদি কোনো ধূমপানকারী ব্যক্তির পাশে স্বলাতে দাঁড়াই, নির্ঘাত তার মুখের গন্ধ অস্বস্থিতে ফেলে। যার কারণে স্বলাতে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। মহামান্য আলেমগণ নিশ্চয়ই এই সব আয়াত প্রায় তেলাওয়াত করেন এবং উক্ত হাদীস সমূহ ভাল করেই জানেন। অথচ মানেন না। আর প্রচারও করেন না। এটা কি ইল্ম গোপন করা নয়?

অনেক আলেম আছেন, যাঁরা শির্ক-বিদআতের সাথে যুক্ত। তাঁর নিশ্চয়ই জানেন, শির্কের গুনাহ্ কত বড় গুনাহ্। তাঁরা কি কুরআনের এই আয়াতগুলি পাঠ করেন না? মহান আল্লাহ্র অমোঘ বাণী —

اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰهُ النَّارُ وَ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ.

নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে অংশীদার স্থাপন করে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত হারাম করেছেন এবং তার বাসস্থান হচ্ছে জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোনো সাহায্যকারী নেই (সূরাহ্ মায়েদাহ/৭২)।

অনুরূপ আয়াত —

وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

যদি তারা শির্ক করে তাহলে তাদের সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যাবে (সূরাহ্ আনআম/৮৮)।

শির্ক সম্পর্কে কুরআনে বহু আয়াত আছে, অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি দেখে নিতে পারেন। যথা - সূরাহ্ লুকমান/১৩, যুমার/৩৮, ৬৫, নিসা/৪৮)।

এ সম্পর্কে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর হাদীস দেখুন —

قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ

এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহ্র রসূল! আল্লাহ্র নিকট কোন গুনাহ্টি সবচেয়ে বড়? তিনি বললেন, আল্লাহ্র কোনো সমকক্ষ সাব্যস্ত করা। অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৪৯)।

তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) অন্যত্র বলেছেন —

مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ

যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে বিন্দুমাত্র শরীক করবে, সে জাহান্নামে যাবে (মুসলিম ৯২,৯৩, মিশকাত-৩৮, আরো অনেক হাদীস আছে)।

আলেমগণ কীভাবে শির্কের সাথে যুক্ত, তা এবার একটু পর্যালোচনা করা যাক। বহু আলেম আছেন, যাঁরা তাবিজ, কবজ, ধাগা ইত্যাদি বস্তু তৈরি করে লোকেদের দেন এবং বিনিময়ে ভাল অঙ্কের টাকা তাঁরা গ্রহণ করেন। তাঁরা কি এইসব সহীহ্ হাদীস জানেন না? রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন — اِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَ التِّوَلَةَ شِرْكٌ নিশ্চয়ই ঝাড়-ফুঁক তাবিজ এবং ভালবাসা সৃষ্টি করার জন্য কৌশল অবলম্বন করা শির্ক (আবু দাউক, মিশকাত ৪৫৫২)।

অপর হাদীসের বর্ণনায় এসেছে —

مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ اَشْرَكَ

যে লোক কোনো তাবিজ কবজ বাঁধবে সে শির্ক করবে (আহমাদ)।

অনুরূপ হাদীস আরো অনেক আছে যে সব হাদীস দ্বারা তাবিজ, কবজ, আংটি, পাথর, মন্ত্রপূত সূতা ইত্যাদি ধারণ করা শির্ক সাব্যস্ত করা হয়েছে। অথচ বেশ কিছু আলেম এগুলোর কাজের সাথে যুক্ত আছেন। তাঁদের তো এসব বিষয়ের বিধান অবশ্যই জানার কথা। তবে তো তাঁরা জেনে শুনেই এই নিষিদ্ধ কাজ করে চলেছেন। এটা কি ইল্ম গোপন করা নয়?

এমন বহু আলেম আছেন, যারা মাযার, দরগাহ্, খানকা ইত্যাকার স্থানের সাথে সরাসরি যুক্ত আছেন। যেসব স্থানে সবচেয়ে বেশি শির্কী কাজ হয়ে থাকে, যথা, মৃত অলি-আউলিয়ার নিকট সাহায্য চাওয়া, সন্তান কামনা করা, রোগমুক্তির প্রার্থনা, চাকুরি হওয়ার প্রার্থনা করা, নজর-নিয়াজ মানত করা ইত্যাদি কাজ, যা সবচেয়ে বড় ধরণের শির্ক; তা সবই করা হয়।

অথচ আল্লাহ্‌র বাণী —

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوْمًا مَّخْذُوْلًا

আল্লাহ্‌র সাথে অপর কোনো ইলাহা স্থির করনা, অন্যথায় তুমি নিন্দিত ও অসহায় হয়ে পড়বে (বাণী ইসরাঈল ২২)।

অন্যত্র রব্বুল আলামীন বলেছেন —

وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ.

আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোনো ইলাহ্‌কে আহ্বান করে থাকে যে বিষয়ে তার কোনো দলীল প্রমাণ নেই; তার হিসাব তার প্রতিপালকের নিকট রয়েছে। নিশ্চয় কাফিরগণ কৃতকার্য হবে না (সূরাহ্ মুমিন ১১৭)।/

অপর আয়াতে বলা হয়েছে —

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَالَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ.

আল্লাহ্ ছাড়া এমন কোনো সত্ত্বাকে ডেকোনা, যা তোমার কোনো উপকার করতে পারেনা এবং ক্ষতিও করতে পারে না। যদি তুমি এমন কাজ কর, তাহলে নিশ্চয়ই তুমি অত্যাচারীর অন্তর্ভুক্ত (সূরাহ্ ইউনুস/১০৬)।

নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সালাম) এর এ সম্পর্কে হাদীস দেখুন —

اَلَا وَاِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ وَ صَالِحِيْهِم

মনে রেখো, নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের নাবী এবং নেক্‌কার লোকদের কবরকে মাসজিদ বানিয়ে ছিল। সাবধান! তোমরা কবরকে মাসজিদ বানিও না। আমি তোমাদেরকে কবরকে মাসজিদ বানাতে নিষেধ করছি (মুসলিম, মিশকাত ৭১৩)।

অপর হাদীস — اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ

রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) প্রার্থনা করে বলেন, হে আল্লাহ্! তুমি আমার কবরকে মূর্তিতে পরিণত করোনা, যার ইবাদাত করা হবে। আল্লাহ্ ঐ জাতির উপর রাগান্বিত হয়েছেন, যারা তাদের নাবীগণের কবরকে মাসজিদে পরিণত করেছে (আবূ দাউদ, মিশকাত ৭৫০। অনুরূপ আরো অনেক হাদীস আছে। ইচ্ছুক ব্যক্তিরা মিশকাত ও অন্য হাদীসগ্রন্থ দেখে নিতে পারে)।

এক্ষণে আমরা উল্লিখিত কুরআনী আয়াত ও নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সহীহ্ হাদীস দ্বারা জ্ঞাত হলাম যে, কবর, মাযার, দরগাহ্, খানকাহ্ ইত্যাদি স্থানে যে সব কর্ম অনুষ্ঠিত হয় তা সবই শির্ক। শির্কে আকবার। আর যাঁরা এর সাথে যুক্ত আছেন, তাঁরাও আলেম এবং অবশ্যই তাদের এই সব কুরআনের আয়াত ও হাদীস সমূহ জানা আছে। অথচ তা তাঁরা নিজ জীবনে বাস্তব আকারে প্রয়োগ করেন না এবং জনসাধারণের মাঝে প্রচার ও করেন না। অতএব তাঁরা নিশ্চয়ই ইল্‌ম গোপন করছেন।

মুসলিম সমাজের এমন অনেক আলেম আছেন, যাঁরা বিদআতের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাঁরা বিদআতী কাজকে নেকীর কাজ বলেই মনে করেন। এমন কাজ যে করা নিষিদ্ধ, তা তাঁরা মানতে রাযী নন।

বিদআত কাকে বলে আমরা মোটামুটি সবাই জানি। যথা যে সম্পর্কে কুরআনে কোনো নির্দেশ নেই এবং যে কাজ নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) করেননি, করতে বলেননি এবং করার অনুমতিও দেননি, সেই কাজকে সওয়াবের আশায় শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত করা ও তদ্অনুযায়ী আমল করা। যেমন 'ফাতেহা দোয়াজ দাহাম, শবে বরাত, শবে মিরাজ, ফাতেহা ইয়াজ দাহাম, কুলখানী, সাবিনা পাঠ, মিলাদ, চাল্লিশা, মৃত অলির কবরে চাদর চড়ানো, ফুল দেওয়া, ধূপ-আগরবাতী, মোমবাতি জ্বালানো, ওরশ

উপলক্ষ্যে মেলা লাগানো, মেলায় নারী-পুরুষ-আবাল বৃদ্ধ সকলের অবাধ জমায়েত হওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক রকমের বিদআতের প্রচলন করা হয়েছে এবং যা বর্তমানে অত্যন্ত জোরে সরে রমরমিয়ে চলছে। এমন বললেও হয়তো বা উক্তোক্তি হবে না যে, উক্ত বিদআতী আমলগুলিই যেন সুন্নাত। যা পালন করা সমস্ত মুসলিমের জন্য অপরিহার্য। যারা ঐসব কাজ করে না, তারাই যেন ভুল পথে আছে। তারা গুস্তাখে রাসূল, গুস্তাখে আউলিয়া। এরা মুমিন নয়। এমনি বক্তব্য ঐসব বিদআত পালনকারী আলেমদের।

আসুন, এবার বিদআত সম্পর্কে কুরআন ও হাদীস কী বলে তা একটু পর্যালোচনা করে দেখি। আল্লাহ্ রব্বুল ইজ্জাত নির্দেশ দিচ্ছেন এই বলে —

يَـآيُّهَـا الَّـذِيـنَ اٰمَـنُوٓا اَطِيُعُوااللّٰهَ وَ اَطِيُعُوا الرَّسُوُلَ وَ لَا تُبُطِلُوٓا اَعُمَالَكُمُ.

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্কে মান্য কর। আর রসূলের আনুগত্য করো। তা না করে তোমরা তোমাদের আমল বাতিল করো না (সূরাহ্ মুহাম্মাদ/৩৩)।

অপর আয়াতে এভাবে নির্দেশ দিয়েছেন —

مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوُلِهٖ مِنُ اَهُلِ الُقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوُلِ وَلِـذِى الُقُرُبٰى وَالُيَتٰمٰى وَ الُمَسٰكِيُنِ وَابُنِ السَّبِيُلِ كَىُ لَا يَكُوُنَ دُوُلَةًۢ بَيُـنَ الُاَغُنِيَآءِ مِنُكُمُ وَ مَآ اٰتٰـكُمُ الرَّسُوُلُ فَـخُـذُوُهُ وَ مَـا نَهٰـكُـمُ عَـنُهُ فَانُتَهُوُا وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيُدُ الُعِقَابِ.

রসূল তোমাদের যা দিয়েছেন, তা গ্রহণ করো এবং তিনি যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন কর। আল্লাহ্কে ভয় করো, নিশ্চয়ই তিনি কঠিন শাস্তি দাতা (সূরাহ্ হাশর/৭, অনুরূপ আয়াত আরো অনেক আছে)।

এবার নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর হাদীস দেখুন — مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছুর উদ্ভব ঘটালো, যা তার মধ্যে নেই তা প্রত্যাখ্যাত (গ্রহণযোগ্য নয়) (বুখারী ২৬৯৭, মুসলিম ১৭১৮)। অপর হাদীস —

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ

রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, (যা প্রত্যেক খতিব ও বক্তা, বক্তব্যের শুরুতে পাঠ করেন) অতঃপর অবশ্য অবশ্যই সর্বোত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার কিতাব, আর সর্বোৎকৃষ্ট পথ হচ্ছে মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর পথ। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট হল দ্বীনের মধ্যে নতুন (মনগড়া) জিনিস সৃষ্টি করা। আর এরূপ সব নতুন জিনিসই গুমরাহী (পথভ্রষ্ট) (মুসলিম ৮৬৭)।

মিশকাত গ্রন্থের 'কিতাব সুন্নাহ্কে আঁকড়ে ধরা' অধ্যায় একটু চোখ বুলিয়ে নিন, দেখবেন বিদআতের ভয়াবহতা সম্পর্কে আরো কত হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

এবার আমাদের কথা হল, যেসব লোক উক্ত বিদআতী আমলের উদ্যোক্তা, তারাও অবশ্যই আলেম। তাঁরাও নিশ্চয়ই এইসব কুরআনী আয়াত ও হাদীসসমূহ পাঠ করেন। কিন্তু তার উপর নিজেরাও আমল করেন না, অন্যদেরকেও আমল করতে বলেন না। এক্ষেত্রে তারা অবশ্যই ইলম গোপন করার দায়ে দায়ী। আর এমন সব আলেমদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ্র অমোঘবাণী —

مَثَلُ الَّذِيُنَ حُمِّلُوا التَّوُرٰىةَ ثُمَّ لَمُ يَحُمِلُوُهَا كَمَثَلِ الُحِمَارِ يَـحُـمِـلُ اَسُـفَـارًا بِئُسَ مَثَلُ الُقَوُمِ الَّذِيُنَ كَذَّبُوُا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ لَا يَهُدِى الُقَوُمَ الظّٰلِمِيُنَ.

যাদেরকে তাওরাতের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছিল, অতঃপর তা তারা বহন করেনি; তাদের দৃষ্টান্ত পুস্তক বহনকারী গর্দভ। কত নিকৃষ্ট সেই সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত, যারা আল্লাহ্র আয়াত সমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। আর আল্লাহ্ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না (সূরাহ্ জুমুআহ/৫)।

অত্র আয়াতের মূল বক্তব্য হল ''এখানে আমল বিহীন ইয়াহুদীদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে যে, যেমন গাধা, তার পিঠে যে কিতাবগুলো বোঝায় করা আছে, তাতে কী লেখা আছে অথবা তার উপর যা বোঝায় করা হয়েছে তা কিতাব না ঘাস-ভূসি, তা জানে না। অনুরূপ এই ইয়াহুদীরাও। তাদের কাছে তাওরাত আছে।

তা পড়া ও মুখস্থ করার দাবীও করে, কিন্তু তারা না তা বোঝে, আর না তার নির্দেশ অনুযায়ী আমল করে। বরং তার অপব্যাখ্যা এবং তাতে হেরফের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করে। কাজেই প্রকৃতপক্ষে এরা গাধার থেকেও বেশি নিকৃষ্ট। কারণ গাধা জন্মগত ভাবেই বিবেক ও বোধ শক্তি থেকে বঞ্চিত হয়, আর এদের মধ্যে বিবেক বুদ্ধি বিদ্যমান, কিন্তু এরা তার সঠিক ব্যবহার করেনা। এইজন্য পরে বলা হয়েছে যে, এদের দৃষ্টান্ত বড়ই নিকৃষ্ট। অনুরূপ যারা তাদের অন্তর, চক্ষু ও কর্ণের সঠিক ব্যবহার করেনা, তাদের সম্বন্ধে মহান আল্লাহ্ বলেছেন —

أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَٰفِلُونَ.

এরা চতুষ্পদ জন্তুর মত, বরং তার চেয়েও নিকৃষ্টতর (সূরাহ্ আরাফ/১৭৯)।

হুবহু দৃষ্টান্ত সেই মুসলিমদের, বিশেষ করে আলেমদেরও যারা কুরআন পড়ে ও মুখস্থ করে কিন্তু তার নির্দেশ অনুযায়ী আমল করে না। যেমন - যে কিতাব বর্জন করে,তাকে সেই কুকুরের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যাকে তাড়া করলে সে জিভ বের করে হাঁপায় এবং এমনি ছেড়ে দিলেও সে জিভ বের করে হাঁপাতে থাকে (সূরা আরাফ্/১৭৬, তাফসীর আহ্সানুল বায়ান, সূরাহ্ জুমুআহ ৫নং আয়াতের তাফসীর দেখুন)।

নাবী কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এই শ্রেণির আলেমদের লক্ষ্য করেই বেদনার্ত হয়ে বলেছেন —

وَإِنَّ مِمَّا أَتَخَوَّفُ عَلَى أُمَّتِي أَئِمَّةً مُضِلِّينَ

আমি সবচেয়ে যাদের বেশি ভয় করি, আমার উম্মাতের জন্য, তারা হচ্ছে ভ্রান্ত আলেম সমাজ (ইবনু মাজাহ্ ৩৯৫২)। আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আরও বলেছেন—

يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ

শেষ যামানায় কিছু সংখ্যক মিথ্যাবাদী দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে. তারা তোমাদের নিকট এমন সব অলীক কথা-বার্তা উপস্থিত করবে, যা না তোমরা শুনেছ, না তোমাদের বাপ-দাদা শুনেছে। সাবধান ! তোমরা তাদের থেকে বেঁচে থাকো। যাতে তারা তোমাদের পথভ্রষ্ট করতে না পারে এবং তোমাদের বিপথগামী করতে না পারে (মুসলিম, মিশকাত ১৫৪, আবূ দাউদ ৪৬১০, আহমাদ ১৫২৩, ১৫৪৮)।

আর এমন আলেমদের সম্পর্কে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) হুঁশিয়ারী দিয়েছেন এই বলে —

مَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

যে ব্যক্তি এমন কিছুর দাবি করে যা তার নয়, অথবা তার অবগতিতে নেই, তা হলে সে আমার শরীআতের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং সে তার বাসস্থান জাহান্নামে করে নেয় (মুসলিম, মিশকাত ৩৭৬৫)।

অন্তিম লগ্নে শুধু এটুকুই বলব, আমাদের সমাজের অনেক অলেম অনেক রকম ক্রিয়া-কর্মে যুক্ত আছেন; তার কিছুটা আমরা এ আলোচ্য নিবন্ধে ব্যক্ত করলাম। উদ্দেশ্য, যাতে সকল শ্রেণির আলেমগণ কুরআন ও সহীহ্ সুন্নাহ্‌র দিকে ফিরে আসেন। নিজে সহীহ্ শুদ্ধ আমল করে পরকালে ধন্য হন এবং অন্যদেরকেও সঠিক পথের দিশা দিয়ে সফল করে গড়ে তুলতে পারেন। কারণ আল্লাহ্ সুবহানাহু অ তাআলা তার কালাম মাজাদে ঘোষণা দিয়েই রেখেছেন এই বলে —

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا o الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا o

(হে নাবী) ! তুমি বল, আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দেব তাদের, যারা কর্মে (আমলে) সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত ? ওরাই তারা, পার্থিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা পন্ড হয়, যদিও তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করছে (সূরাহ্ কাহফ/১০৩-১০৪)। আল্লাহ্ তাআলার এই সাবধানী বাণীর আওতাভুক্ত যেন আমরা না হই। হে আল্লাহ্ রাহমানুহর রহীম, আমাদের সকলকেই তোমার সহজ সরল পথের দিশা দাও এবং পরকালের মুক্তির পথ উন্মুক্ত করে দাও — আমীন।

যুগে যুগে ছদ্মবেশে আমেরিকার বর্বরতা

এম. এ. হান্নান

একটি বহু পুরাতন প্রবাদ বাক্য আছে 'চোরের মায়ের বড়ো গলা।' নিজের অপরাধ, ভুল-ভ্রান্তি আড়াল করা এবং সে অপরাধের দায় বড়ো গলায় অন্যের উপর চাপানোর যে মানসিকতা, প্রবৃত্তি, তাকেই 'চোরের মার বড়ো গলা' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

আমেরিকার চোর মার গলা বড়ো হয়ে গেছে। পৃথিবীব্যাপী নেতৃত্ব দানের উদ্দেশ্যে সে চমকপ্রদ বুলি আওড়াচ্ছে যেমন স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, মানবাধিকার, নর-নারীর জানমালের নিরাপত্তা কায়েম করা। আমেরিকার এ বুলি সম্পূর্ণ ধাপ্পা। কার্যকলাপে সে ধ্বংস করছে অন্যদের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, মানবাধিকার, মানুষের জানমালের নিরাপত্তা।

যুগে যুগে আমেরিকার যে বর্বরতার নজির দেখিয়েছে তা অত্যন্ত বীভৎস্য। আমেরিকার রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রফেসর উইলিয়াম হান্টিংটনের বিখ্যাত Clash of Cicilization বই পড়ে আমেরিকা পাগলা কুকুরের মত ক্ষেপে উঠেছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী পরিষ্কারভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, ইসলামই তথা মুসলিমরাই একমাত্র পাশ্চাত্য সভ্যতার মোকাবেলায় দাঁড়াতে পারে বা পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথে ইসলামী সভ্যতারই একটি অনিবার্য সংঘর্ষ হবে। অতএব এসব ক্ষেত্রে তিনি আমেরিকাসহ পাশ্চাত্য সভ্যতার দাবীদারদের পরামর্শও দিয়েছেন কীভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি ইসলামী সভ্যতাকে মোকাবেলা করা যাবে। বিশেষ করে আমেরিকা নিশ্চিতভাবেই এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, বিশ্ব নেতৃত্বে একচ্ছত্রভাবে প্রভাব বজায় রাখতে হলে অবশ্যই ইসলামী শক্তির উত্থান ঠেকাতে হবে। এজন্য তারা ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। আমেরিকা মুসলিম দেশগুলোকে কব্জা করার জন্য নতুন নতুন ফরমুলা আবিষ্কার করে চলেছে।

আব্রাহাম লিংকন, টমাস জেফারসন, উড্রো উইলসনের আমেরিকায় আজ গণতন্ত্র পরাজিত। একটি ছোট উগ্রবাদী যুদ্ধবাজ গোষ্ঠির হাতে আমেরিকার ৩০০ মিলিয়ন মানুষ আজ বন্দী।

আফগানিস্তান ও ইরাক দখল ঃ— ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর নিউয়র্কের টুইন-টাওয়ার ধ্বংসের ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে ওসামা বিন লাদেন নামক এক যাযাবরকে অযুহাত বানিয়ে 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' নামে আফগানিস্তানে লক্ষ লক্ষ টন বোমা নিক্ষেপ করে লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যা করে আমেরিকা যে নিষ্ঠুর বর্বরতার নিদর্শন রেখেছে তা দুনিয়ার ইতিহাসে বিরল। আফগানিস্তানের উপর আমেরিকার এই যুদ্ধ ছিল আরোপিত এবং অন্যায় যুদ্ধ। সেখানে তালেবান সরকারের পতন ঘটিয়ে আমেরিকা মুতায়েন করেছে ৭০০০ মার্কিন সৈন্য।

২০০৩ সালে আমেরিকা ইরাকের নিকট গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র আছে বলে প্রচারণা চালিয়ে জাতিসংঘকে অগ্রাহ্য করে ইরাকের উপর হামলা চালিয়ে অবশেষে ইরাককে দখল করে নিল। গোটা বিশ্ববাসী প্রতিবাদ জানিয়েছে কিন্তু আমেরিকা তা শুনেনি। জাতিসংঘের দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র দখল করে আমেরিকা প্রমাণ করলো তাদের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মুকাবিলায় জাতি রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নিরাপদ নয়। আমেরিকা কোনো ধরণের আন্তর্জাতিক আইন বা বিধানে বিশ্বাসী নয়। নীতি, নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ বলে বিশ্বে আজ কিছুই অবশিষ্ট নেই। বিশ্ব এক নৈরাজ্যের যুগে পদার্পণ করেছে। এখানে এক দানবীয় শক্তি তার স্বেচ্ছাচার চালাবে যখন যার ইচ্ছা তার ঘাড় মটকাবে।

আমেরিকা বর্বরতা গণহত্যা, গুপ্তহত্যা, ষড়যন্ত্র-চক্রান্তের ঘৃণ্য তাগুবের খতিয়ান সুবিশাল। বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য বিস্তারের পরিকল্পনার অংশ হিসাবেই এই তাণ্ডব।

(১) ১৯৪৫ সালে আগষ্ট মাসে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আণবিক বোমা নিক্ষেপ করে ২০ লাখ মানুষ হত্যা করে এবং বিস্তীর্ণ এলাকা ধ্বংস করে। (২) ১৯৪৫-৫৩ সাল পর্যন্ত জাতিসংঘ বাহিনীর ছদ্মাবরণে মার্কিন বাহিনী উত্তর কোরিয়ার ২৫ লাখ লোককে হত্যা করে। (৩) ১৯৪৯-৫৩ সালে আলবেনিয়ায় গুপ্ত হামলা চালিয়ে সহস্রাধিক মানুষকে হত্যা করে। (৪) ১৯৪৭-৫০ সালে গ্রীসকে তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করে। (৫) ১৯৪৮-৫৬ সাল পর্যন্ত পূর্ব ইউরোপে চালায় অপারেশন ইসপ্লিন্টার ফ্যাক্টর। এতে হত্যা করা হয় চেকোস্লোভাকিয়াতে এক লাখ ঊনসত্তর হাজার এবং হাঙ্গেরী, পূর্ব জার্মানী, পোল্যাণ্ড, বুলগেরিয়ায় হত্যা করা হয় ৫ লাখ লোক। (৬) ১৯৪৮ সালে বৃটেনের সহায়তায় মধ্যপ্রচ্যের মুসলিম জনপদ ফিলিস্তিনের অধিবাসীদের উৎখাত করে ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাঈল প্রতিষ্ঠা করে আমেরিকা। বিশ্বে অন্যতম সন্ত্রাসী রাষ্ট্র ইসরাঈলকে আমেরিকা

অদ্যাবধি সহায়তা দিয়ে আসছে। ১৯৫৭ সালে আমেরিকার সাহায্যেই ইসরাঈল গাজা উপত্যকা ও সিনাই উপদ্বীপ দখল করে। এ যাবৎ ইসরাঈল কমপক্ষে ৬৪ বার জাতিসংঘ প্রস্তাব লংঘন করেছে আমেরিকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদে। ইতিহাসের ঘৃণ্যতম হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে ও মানবাধিকার লংঘন করেছে ইসরাঈল প্রায় প্রতিদিন তাও আমেরিকা সার্বিক সহায়তায়। (৭) পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে প্রায় বিশ বছরব্যাপী আমেরিকা ভিয়েতানাম যুদ্ধে নাপাস বোমা, জীবাণু বোমাসহ ব্যাপক বিধ্বংসী মরণাস্ত্রের বেপরোয়া ব্যবহার করে ৪৩ লাখ ভিয়েতনামীকে হত্যা করে। (৮) ১৯৫৮ সালে সংখ্যালঘু খৃষ্টানদের অনুরোধে ১৪০০০ মার্কিন সৈন্য লেবাননে অবতরণ করে ৫০ হাজার মুসলিমকে হত্যা করে। (৯) ১৯৫৫-৭৩ কম্বোডিয়া এবং ১৯৫৭-৭৩ লাওসের যুদ্ধে আমেরিকা কমপক্ষে ২০ লাখ মানুষকে হত্যা করে। (১০) ১৯৫৯ সালে আমেরিকা হামলা চালায় হাইতিতে। ১৯৯৩ সালে আবার হামলা চালিয়ে দেশটির শাসক জেনারেল সিড্রাসকে বিতাড়িত করে। এ বছরেই সোমালিয়ায় চালায় অপারেশন রোস্টার হোপ এবং হত্যা করে ২০ হাজার সোমালিয়ানকে। (১১) ১৯৬৪ সালে সিআই এ কঙ্গোর জাতীয়তাবাদী নেতা প্যাট্রিস লুমুম্বাকে হত্যা করে। জাতি সংঘের তৎকালীন সেক্রেটারী জেনারেল দ্যাগ হ্যামার শোল্ড এ হত্যাকান্ডের বিরোধিতা করায় বিমান দুর্ঘটনা ঘটিয়ে তাকে ও হত্যা করা হয়। (১২) ১৯৬০ সালে আমেরিকার ডোমিনিকান রিপাবলিকে হামলা চালায় এবং ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত দেশটি দখল করে রাখে। (১৩) ১৯৫৯-৮০ সাল পর্যন্ত আমেরিকা বিভিন্ন সময় কিউবার উপর রাসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্র প্রয়োগ করে। ফলে লাখ লাখ মানুষ ও পশু মারা যায় এবং ধ্বংস হয় ফসল। (১৪) চিলির প্রেসিডেন্ট সালভাদর আলেন্দে চিলির মার্কিন মালিকানাধীন খনি কোম্পানী জাতীয়করণ করলে ক্ষিপ্ত মার্কিনীরা ১৯৭৩ সালে সিআই এর মাধ্যমে আলেন্দেকে হত্যা করে। নরপিশাচ জেনারেল পিনোচেটকে ক্ষমতায় বসায়। মার্কিন প্রত্যক্ষ সহায়তায় পিনোচেট পঞ্চাশ হাজার বিরোধী রাজনৈতিক নেতা-কর্মীকে হত্যা করে। (১৫) ১৯৬৪-৭৩ সালে সিআই এ বলিভিয়া ও পানামায় অভ্যুত্থন ঘটায় এবং কোস্টারিকার জোসে ফিগুয়াসকে ক্ষমতাচ্যুত করে। (১৬) ১৯৭৯-৮১ সালে গ্রানাডায় অগ্রাসন চালিয়ে মার্কিন বাহিনী ঐ দেশের সরকার প্রধান মরিস বিশপসহ সহস্রাধিক ব্যক্তিকে হত্যা করে। (১৭) ১৯৮০ সালে নিকারাগুয়ায় ১৫ হাজার এবং পানামায় হামলা চালিয়ে ৮ হাজার মানুষকে হত্যা করে। (১৮) ১৯৮৮-৮৯ সালে মার্কিনীরা লিবিয়ার নেতা মুয়াম্মার গাদ্দাফীকে হত্যা করার জন্য বিভিন্নভাবে হামলা চালায়। এতে তার দু বছর বয়সী শিশুকন্যাসহ বিভিন্ন সময়ের হামলায় এক সহস্রাধিক লিবীয় নাগরিক নিহত হয় (১৯) ১৯৯১ সালে মার্কিনীরা বৃটেনের সহায়তায় ইরাকে পরিচালনা করে ‘অপারেশন ডেজার্ট স্টর্ম’ ৪৪ দিনব্যাপী এই হামলায় ব্যাপক বোমাবর্ষণ ছাড়াও ৯৪টি ক্রুজ ক্ষেপনাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়। প্রায় ৩০ লাখ লোকের মৃত্যু ঘটে এই হামলায়। ইরাকের ১৫ লাখ শিশু অর্থনৈতিক অবরোধের শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ করে দুধ, ঔষধ ও পণ্যের অভাবে। (২০) ১৯৬০ সাল থেকে এ যাবৎ কলম্বিয়ায় মাদক চোরাচালান বন্ধ করার নামে মার্কিনীরা হত্যা করে আনুমানিক ৬৭ হাজার কলম্বিয়াকে। (২১) ১৯৯২-৯৩ সালে মার্কিনীদের সহযোগিতায় খৃষ্টান ও ইহুদীরা বসনিয়া হার্জেগোভিনায় মুসলিমদের উপর হামলা চালিয়ে হত্যা করে ৩০০০ মানুষ। (২২) ১৯৯৪ সালে হেবরন মসজিদে মার্কিন মমদপুষ্ট ইহুদীরা হামলা চালিয়ে ফজরের স্বলাত আদায়রত শতাধিক মুসলিমকে ব্রাশ ফায়ারে হত্যা করে। (২৩) ১৯৯৮ সালের ৮ আগষ্ট কেনিয়া ও তানজানিয়ায় বোমা হামলা চালিয়ে মার্কিনীরা হত্যা করে ২২৫ জন নাগরিককে এবং আহত করে প্রায় চার হাজার মানুষকে। (২৪) ১৯৯৮ সালের ২০ আগষ্ট মার্কিনীরা একই সঙ্গে বোমা ও ক্ষেপনাস্ত্র হামলা চালায় আফগানিস্তান ও সুদানে। ফলে কয়েক হাজার মানুষ নিহত হয়। ২০০১ সালের ৭ অক্টোবর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় দফা হামলা চালায় আফগানিস্তানে। এ সময়ে ক্লাস্টার বোমাসহ ব্যাপক গণবিধ্বংসী বোমা ব্যবহার করায় তিন লক্ষাধিক আফগান মুসলিম নিহত হয়। ২০০৩ সালের ২০ মার্চ পুনরায় হামলা চালিয়ে ১০ এপ্রিল মার্কিনীরা দেশটি দখন করে নেয়। (২৫) বিগত ৬ দশকে বিশ্বে যত সামরিক অভ্যুত্থান, গুপ্ত হত্যা, আঞ্চলিক ও জাতিগত সংঘাত ও গণহত্যা ঘটনার সংঘটিত হয়েছে তার প্রত্যেকটির সাথে কোনো না কোনোভাবে আমেরিকা অথবা সিআই এ জড়িত ছিল। ১৯৪৯ সালে সিরিয়ায় নির্বাচিত সরকার, ১৯৫৩ সালে ইরানে। ডঃ মুসাদ্দেকের সরকার, ১৯৬৬ সালে ইন্দোনেশিয়ায় প্রেসিডেন্ট জেনারেল সুয়েকর্নোর সরকার উৎখাত করে আমেরিকা। অসংখ্য দেশের সরকার উৎখাত করে আমেরিকা। স্বল্প পরিসরে যার বিবরণ দেওয়া কঠিন। বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে নানাভাবে হস্তক্ষেপের যাবতীয় কুটকৌশল ও জাল পেতে রেখেছে আমেরিকা। সুতরাং নিষ্ঠুরভাবে মানুষ হত্যা এবং জঘন্য

মানবাধিকার লংঘন আমেরিকার জন্য নতুন কিছু নয়।

বিশ্বব্যাপী সামরিক ঘাঁটি ও সৈন্য মুতায়েন ঃ— সাম্রাজ্যবাদী লিপ্সা পূরণের জন্যই যে আমেরিকা বিশ্বব্যাপী সামরিক আধিপত্য বিস্তার করছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিশ্বের অনেক দেশেই আমেরিকার সৈন্য মোতায়েন আছে এবং রয়েছে অসংখ্য ঘাঁটি।

(১) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই জাপানে আছে ১৮ হাজার, ওকিনাওয়ায় সপ্তম নৌবহর ও ২০ হাজার মার্কিন সৈন্য ও ৮৪টি যুদ্ধ বিমান।

(২) দক্ষিণ কোরিয়ায় ২৯,১৫০ মার্কিন সৈন্য।

(৩) প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ গুয়াম, দিয়াগো গার্সিয়া ও অস্ট্রেলিয়ায় আছে মার্কিন নৌ ও বিমান ঘাঁটি।

(৪) থাইল্যান্ডে আছে একটি সেনা কন্টিনজেন্ট।

(৫) ফিলিপাইনে আছে উল্লেখযোগ্য মার্কিন সৈন্য যারা মুসলিম স্বাধীনতাকামীদের উপর হামলা চালিয়ে যাচ্ছে।

(৬) গুয়ানতানামোতে মোতায়েন আছে ২২০০ মার্কিন সৈন্য।

(৭) কলম্বিয়া ও হন্ডুরাজে আছে ৪০০ স্থল ও নৌ সেনা।

(৮) বারমুডা, আইসল্যান্ড ও অ্যাজোর্স দ্বীপপুঞ্জে আছে ১৭০০ মার্কিন সৈন্য।

(৯) ইউরোপে অবস্থান করছে ৯৮ হাজার মার্কিন সৈন্য, জার্মানীতে ৫৬ হাজার এবং ৬০টি যুদ্ধ বিমান, ইটালিতে ১২৪০০, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড, নরওয়ে, পর্তুগাল, স্পেন ও গ্রীসে আছে ৮২৮৩ জন। বলকান অঞ্চলের বসনিয়ায় ২০০০, কাসোভোতে ৫০০০ মার্কিন সৈন্য। তাছাড়া এখানে মার্কিন নিয়ন্ত্রণে ৩৪০০০ ন্যাটো পরিচালিত সৈন্য আছে। হাঙ্গেরী ও মেসিডোনিয়ায় অবস্থান করছে ৮৪০ জন।

(১০) বর্তমান ১৫টি মুসলিম দেশে মার্কিন ঘাঁটি রয়েছে। (ক) সৌদি আরব, (খ) কুয়েত, (গ) কাতার, (ঘ) জর্ডান, (ঙ) আরব আমিরাত, (চ) বাহরাইন, (ছ) ওমান, (জ) মিশর, (ঝ) জিবুতি, (ঞ) তুরস্ক, (ট) আফগানিস্তান (ঠ) পাকিস্তান (ড) ইজবেকিস্তান, (ঢ) তাজিকিস্তান (ণ) ইরাক।

(১১) ভূমধ্যসাগরে মোতায়েন আছে ষষ্ঠ নৌবহর ও ২০০০ মেরিন সেনা এবং প্রশান্ত মহাসাগরে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে ৪টি মার্কিন যুদ্ধ জাহাজ, ১০টি পরমাণু ক্ষেপণাস্ত্র বহনে সক্ষম সাবমেরিন এবং ডেস্ট্রয়ারসহ বিভিন্ন ধরণের ৫৫টি রণতরী।

মানুষ হত্যার জন্য বিশাল সামরিক বাজেট ঃ— মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের গণবিধ্বংসী অস্ত্র খুঁজে বেড়ায়। অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতেই মজুদ আছে বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্রের ভাণ্ডার। ২০০৩ সালের মার্কিন বাজেট ২১২৮ বিলিয়ন ডলার এবং এর মধ্যে সামরিকখাতে বরাদ্দ ৩৭৯ বিলিয়ন ডলার। এত বিশাল বাজেটের লক্ষ্য হচ্ছে শক্তি প্রয়োগ করে অবাধ্য রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাষায় শয়তানের দোসরদের দমন করা। মিঃ বুশের ভাষায় ইরাক, ইরান ও উত্তর কোরিয়া এই তিনটি দেশ শয়তানের দোসর। পরবর্তীতে তারা সিরিয়া, কিউবা ও লিবিয়াকে এই তালিকাভুক্ত করেছে। ২৫টি রাষ্ট্রকে তারা কালো তালিকাভুক্ত করেছে তার মধ্যে ২৪টিই মুসলিম রাষ্ট্র। বর্তমানে গোটা মুসলিম বিশ্বই আসলে আমেরিকার টার্গেটের লক্ষবস্তু। আমেরিকা তো ঘোষণাই করে দিয়েছে যে, যারা তাদের সাথে নেই তাদেরকে গণ্য করা হবে তাদের শত্রু হিসাবে। যে কোনো দেশ সন্ত্রাস করছে বলে মনে করলেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সে দেশের উপর হামলা চালাবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে প্রেসিডেন্ট বুশ এবং তার যুদ্ধমন্ত্রী রামসফেল্ডের পক্ষ থেকে।

আমেরিকার পারমাণবিক অস্ত্র ঃ ১৯৪৫ এ প্রথম পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের পর আজ পর্যন্ত মোট ১০৩০ বার এই কাজ করেছে আমেরিকা। এখন কম্পিউটার অ্যাসিসিলেশন পদ্ধতি চালু হবার পর আর বিস্ফোরণের দরকার পড়ে না। বর্তমানে মার্কিন ভাণ্ডারে রয়েছে ১২০৭০টি বড় মাপের পারমাণবিক বোমা ও প্রায় এক হাজার ছোটো বোমা। এগুলি নিক্ষেপের জন রয়েছে ১ লক্ষেরও বেশি পারমাণবিক অস্ত্র বহনযোগ্য (ব্যালেস্টিক) ক্ষেপনাস্ত্র। রয়েছে আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র বা ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালেস্টিক মিসাইল, যা ৮১০০ মাইল দূরের সঠিক লক্ষ্য বস্তুতে পারমাণবিক অস্ত্রের আঘাত হানতে পারে।

জাতিসংঘ এখন আমেরিকার আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। বিশ্বসংস্থা হিসাবে এই জাতিসংঘের কোনো মূল্য নেই। জাতিসংঘের জন্ম থেকেই আমেরিকাসহ কতিপয় বড় রাষ্ট্রের মর্জিমাফিক কাজ করে আসছে।

স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক দেশ বলে আমেরিকা পরিচিত। অথচ ২০ লাখ মানুষ আমেরিকার কারাগারে বন্দী। ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর কয়েক হাজার মুসলিম যুবককে গ্রেফতার করেছে। তাদের ভাগ্যে কি ঘটেছে তা কেউ জানেনা। আত্মীয় স্বজন চিন্তায় পাগল।

সাদ্দাম হোসেনের নিকট গণবিধ্বংসী অস্ত্র আছে এই মিথ্যা

অজুহাত দাঁড় করিয়ে আমেরিকা ইরাকে হামলা করে দেশটি দখল করে নিল এবং ধ্বংস যজ্ঞ চালালো। অথচ ইসরাঈলের কাছে ইরাকের তুলনায় অনেক বেশি মারণাস্ত্র আছে তার জন্য তো ইসরাঈলের উপর আমেরিকা হামলা চালায়নি. ইসরাঈল ৬৪ বার জাতিসংঘের প্রস্তাব লংঘন করেছে আমেরিকার মদদেই।

সাম্রাজ্য বিস্তারের লোভে বেসামাল মিঃ বুশ ইরাকের তৈলক্ষেত্র দখলের জন্যই যে মিথ্যা অজুহাতে ইরাক দখল করেছে এটা আজ বিশ্ববাসীর কাছে পরিস্কার। আগামী কয়েক দশকে সৌদি আরবের তেলের রিজার্ভ কমে আসবে এবং ইরাকই হবে মধ্যপ্রাচ্যে সর্ববৃহৎ তৈল রিজার্ভের মালিক। এ কারণে যে কোনো মূল্যে ইরাকের তৈল সম্পদ করায়ত্ব করার লালসাই যুদ্ধবাজ বুশের উদ্দীপনার মূল্য বিষয়বস্তু। ইরাকের তৈল ইরাকী জনগণের। অথচ ইরাকের তৈল বিক্রয় করেই পুষিয়ে নেবে আমেরিকার তার যুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতি।

মুসলিম মিল্লাতের করণীয় ঃ মহাগ্রন্থ আল কুরআন বিশ্বনাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সুন্নাহ্ আমাদের একমাত্র অবলম্বন হবে। এখান থেকেই আমাদের শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য নৈতিক ও সামাজিক শক্তি এবং বৈষয়িক ও সামরিক শক্তি অর্জন করতে হবে। কুরআনে এ নির্দেশ আছে। তবে সীমালংঘন করে কাজ করা যাবে না।

এক কালেমার ভিত্তিতে সব মুসলিম রাষ্ট্রকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। যত রকমের মাযহাবী দ্বন্দ্ব আছে লিল্লাহিয়্যাত দূর করতে হবে। মুসলিম রাষ্ট্রগুলো যদি সম্মিলিতভাবে পরিস্থিতি মোকাবেলার কোনো পন্থা উদ্ভাবন করতে ব্যর্থ হয় তাহলে কারও রাষ্ট্রীয় অস্তিত্বই টিকে থাকবে না।

মানবতার সংশোধন ও কল্যাণ সাধনই হবে আমাদের একমাত্র কাম্য। আমেরিকাকে ধ্বংস করা যাবে না। কারণ সেখানে ভাল-মন্দ, নর-নারী, শিশু রয়েছে। আল্লাহ্‌র দ্বীনের দাওয়াত দানকারী একটি মিল্লাত হিসাবে মানবতাকে কল্যাণের পথে আহ্বান করা আমাদের দায়িত্ব। তাদের সংশোধন আমাদের কাম্য। আমেরিকার ভাল মানুষগুলো আমাদের পাশে দাঁড়াবে।

রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মুকাবিলা জরুরী। যেন আল্লাহ্ নির্দেশিত এবং বিশ্বনাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর প্রতিষ্ঠিত খেলাফতী রাজনৈতিক ব্যবস্থা মুসলিম বিশ্বের দেশে দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রই পারে এই পরিস্থিতি মুকাবিলায় জনগণের শক্তিকে কাজে লাগাতে। সব রাষ্ট্রকে এ ব্যাপারে মনোযোগী হতে হবে। আমাদের বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। শুধু শক্তি হলেই হবে না। এজন্য অর্থনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও মিডিয়ার ক্ষেত্রে আমাদের প্রভাব বিস্তার করতে হবে।

মুসলিম দেশগুলোর সংস্কার ও সংশোধন করতে হবে। অনেক দেশে সরকারের বিরুদ্ধে একটি কথা বলারও অধিকার নেই। ন্যায়ের আদেশ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলার অধিকার দিতে হবে। নচেৎ জনগণ বিভ্রান্ত হবে।

মুসলিম বিশ্বকে আত্মনির্ভরশীল হতে হবে। নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। জনশক্তি, সম্পদ, উপায়-উপকরণ, ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থনীতি এমনভাবে আত্মনির্ভরশীল করতে হলে যেন কোনো অন্যায় চাপের মুখে নতি স্বীকার না করতে হয়। নিজের পায়ে দাঁড়াতে না পারলে স্বাতন্ত্র বা স্বাধীনতা কোনটাই রক্ষা করা সম্ভব নয়। বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে আত্মনির্ভরশীল জাতি হিসাবে গড়ে উঠতে হবে।

আজ শক্তিশালী মিডিয়ার দরকার। শত্রুপক্ষ মিডিয়ার মাধ্যমে মিথ্যা প্রচার করে মুসলিমদের ভাবমূর্তি নষ্ট করছে। মুসলিম জাহানের বিপুল সম্ভাবনা আছে নিজস্ব শক্তিশালী জনপ্রিয় মিডিয়া গড়ে তোলার। অর্থ সম্পদ মুসলিম জাহানের প্রচুর।

ইরাক বনাম আমেরিকা যুদ্ধে সীমিত ক্ষমতা নিয়ে আল জাজিরা টি.ভি. চ্যানেল যে আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল তাতে প্রমাণিত হয়েছে আমরাও মিডিয়া জগতে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম। আমাদের সম্পদ আছে, উপায়-উপকরণ আছে, পৃষ্ঠ-পোষকতা ও উদ্যোগের অভাবে আমরা হেরে যাচ্ছি। এসব দূর করে মিডিয়ার ক্ষেত্রে নব দিগন্তের সূচনা করতে হবে।

আজকে ইসলামের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। ইসলাম প্রচার হয়েছে এক হাতে তরবারি অপর হাতে কুরআন নিয়ে। আরও বলা হয় মুসলিমরা সন্ত্রাসবাদী, গোঁড়া, ধর্মান্ধ, পরধর্মে অহিষ্ণু। যেসব মিডিয়া এসব প্রচার করছে তাদের বিভ্রান্তি দূর করার জন্য যেমন মিডিয়ার দরকার তেমনি উপযুক্ত প্রচারক বাহিনীরও দরকার।

আল্লাহ্‌র দয়া কামনা করা প্রত্যেক নর-নারীর একান্ত কর্তব্য। সমগ্র মানব জাতিকে এই সংকটের মহাবিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য সকলকে মহান স্রষ্টার দিকে ফিরে আসার জন্য আহ্বান জানানো ও আল্লাহ্‌র দয়া, রহমত, করুণা কামনায় উদ্বুদ্ধ করা এবং সব বিপদ-আপদ ও বিপর্যয়ের ক্ষতি থেকে হেফাজত করার জন্য দুআ করা আমাদের সকলের দায়িত্ব।

জানা-অজানা

সংকলনে - মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমান

১। প্রশ্ন ঃ যিলহাজ্জ ১১ নবাবী বর্ষে কত জন ইয়াসরেবী যুবক ইসলাম গ্রহণ করেন?

উঃ— ৬ জন ইয়াসরেবী যুবক ইসলাম গ্রহণ করেন।

২। প্রশ্ন ঃ উক্ত ৬ জন সৌভাগ্য ব্যক্তির নাম কী?

উঃ— (ক) বনু নাজ্জার গোত্রের আস্ আদ বিন যারারাহ্ (খ) আওফ বিন হারেস রেফা'আহ, (গ) বনু যুরায়েক গোত্রের রাফে' বিন মালেক বিন আজলান, (ঘ) বনু সালমাহ গোত্রের কুৎবা বিন আমের বিন হাদীদাহ্, (ঙ) বনু হারাম গোত্রের ওক্বা বিন আরে নাবী, (চ) বনু ওবায়েদ বিন গানাম গোত্রের জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ বিন রিআব (ইবনু হিশাম ১/৪২৯-৩২, আর্ রাহীকুল মাখতুম১৩৫ পৃঃ)।

৩। প্রশ্ন ঃ যিলহাজ্জ ১২ নবাবী বর্ষে কতজন ব্যক্তি হজ্জে আসেন?

উঃ— প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ৬ জন ব্যক্তি প্রচারের ফলে পরের বছর ১২ নবাবী বর্ষে পূর্বের পাঁচ জন ও নতুন সাতজন মোট বারো জন হজ্জে আসেন।

৪। প্রশ্ন ঃ পূর্বের কোন ব্যক্তি ১২ নবাবী বর্ষে হজ্জে আসেন নি?

উঃ— জাবের বিন আব্দুল্লাহ্।

৫। প্রশ্ন ঃ ১২ জন সাহাবী কোন স্থানে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সাথে সাক্ষাৎ করেন?

উঃ— আকবাহ নামক স্থানে। এই স্থানটিকে এখন জামরায়ে আকবাহ্ বা বড় জামরাহ্ বলা হয়।

৬। প্রশ্ন ঃ মক্কার কোন স্থানকে 'আকবাহ্' বলা হয়।

উঃ— মিনার পশ্চিম দিকে সংকীর্ণ পাহাড়ী পথ দিয়ে মক্কা থেকে মিনায় যাতায়াত করতে হয় এই সংকীর্ণ সুড়ঙ্গ পথকেই 'আক্বাহ' বলা হয়।

৭। প্রশ্ন ঃ ১২ নবাবী বর্ষে উপস্থিত নতুন সাত জন ব্যক্তির নাম কী?

উঃ— (ক) বনু নাজ্জার গোত্রের মুয়ায বিন হারেস বিন রিফা'আহ, (খ) বনু যুয়াযেক্ব গোত্রের যাকওয়ান ইবনু আবদে ক্বায়েস, (গ) বনু গানাম গোত্রের উবাদাহ বিন সামেত, (ঘ) বনু গানামের মিত্র গোত্রের ইয়াযিদ বিন সালাবাহ্,(ঙ) বনু সালেম গোত্রের আব্বাস্ বিন উবাদাহ্ বিন নাযালাহ্, (চ) বনু আব্দিল আশহাল গোত্রের আবুল হায়সাম মালেক ইবনুত তাইয়েহান, (ছ) বনু আমর বিন আওফ গোত্রের ওয়ায়েম বিন সা'আদহ্ (ইবনু হিশাম ১/৪৩৩ পৃঃ)।

৮। প্রশ্ন ঃ ১২ নবাবী বর্ষে কৃত বায়আতের শর্তগুলি কী ছিল?

উঃ— (ক) তোমরা আল্লাহ্র সঙ্গে কোনো কিছুকে শরীক করবেনা, (খ) চুরি করবে না, (গ) যেনা করবে না, (ঘ) নিজের সন্তানদের হত্যা করবে না, (ঙ) কাউকে মনগড়া অপবাদ দিবে না,(চ) সঙ্গত বিষয়ে আমার অবাধ্যতা করবে না (বুখারী হাঃ ১৮, ৩৮৯২, মুসলিম হাঃ ১৭০৯)।

৯। প্রশ্ন ঃ ইসলামের ইতিহাসে উক্ত বায়আত কি নামে পরিচিত?

উঃ— ইসলামের ইতিহাসে আকবার প্রথম বায়আত বা আকবায়ে উলা হিসাবে পরিচিত।

১০। প্রশ্ন ঃ বায়আত শব্দের অর্থ কী? বায়আত কাকে বলে?

উঃ— বায়আত শব্দের অর্থ অঙ্গীকার। ইসলামের উপরে কৃত অঙ্গীকারকে বায়আত বলা হয় (মিরআতুল মাফাতীহ্ ১ম খণ্ড ৭৫ পৃষ্ঠা হাঃ ১৮ এর ব্যাখ্যা)।

১১। প্রশ্ন ঃ উক্ত বায়আতের গুরুত্ব কী?

উঃ— বায়আতে বর্ণিত ৬টি বিষয়ের প্রতিটি ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এগুলি শুধু সে যুগেই নয় বরং সর্ব যুগেই গুরুত্বপূর্ণ। উক্ত শর্তগুলি বাস্তবায়িত করা ছাড়া কখনও আদর্শ মানব, আদর্শ পারিবার ও আদর্শ সমাজ গঠন করা কখনও সম্ভব নয়।

১২। প্রশ্ন ঃ বায়আত গ্রহণের পর বায়আতকারীরা রসূলের নিকট কী অনুরোধ করেছিলেন?

উঃ— একজন অভিজ্ঞ দাঈ বা প্রচারককে তাদের সঙ্গে পাঠানোর অনুরোধ করেছিলেন।

১৩। প্রশ্ন ঃ রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কাকে মুবাল্লিগ হিসাবে প্রেরণ করেন?

উঃ— মুসআব বিন ওমায়ের বিন হাশেম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে।

পরবর্তী অংশ ৪৬ পাতায়

সওয়াল জওয়াব

সম্পাদনা পরিষদ

১। প্রশ্ন ঃ নববর্ষ উদ্‌যাপনে শরীআতের আলোকে কেমন ? দলীল সহ উত্তর দানে বাধিত করবেন। — আনীসুর রহমান, বহরমপুর।

উত্তর ঃ প্রথমেই জেনে রাখা বাঞ্ছনীয় যে, নববর্ষ উদ্‌যাপন বা কোনো বর্ষের প্রথম দিনের আগমনকে উদ্‌যাপন করার বিষয়টিই হচ্ছে সম্পূর্ণ মানুষের চয়নকৃত বিষয়, যার ঐশী কোনো ভিত্তি নেই। তবে বৎসরের মাসের সংখ্যা বারো যা আল্লাহ্‌র দ্বারা নির্দ্ধারিত (সূরাহ্ তাওবাহ্/৩৬)। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''এমন কোনো বিষয় যা তোমাদেরকে জান্নাতের নিকটে নিয়ে যাবে তার নির্দেশ আমি তোমাদেরকে দিয়েছি, আর যা তোমাদেরকে জাহান্নামের নিকট নিয়ে যাবে তা হতে বিরত থাকতে বলেছি'' (সহীহ্ তারগীব, ২৮৬৬)।

যদি বর্ষ পালন কোনো কল্যাণকর কাজ হত, তাহলে তিনি অবশ্যই তা বলে যেতেন। তিনি নিজে করতেন অথবা তার প্রিয় সাথীগণ করতেন। ইসলামী ইতিহাসের সোনালী যুগে এর কোনো অস্তিত্ব ছিলনা। সঙ্গত কারণেই বিশেষজ্ঞ উলামায়ে দ্বীন একে বিদআত বলে আখ্যায়িত করেছেন। এটা মূলত ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও অগ্নীপূজক পারসিকদের দ্বারা চালুকৃত যা মূলতঃ শয়তানী কুমন্ত্রণার ফসল। পৃথিবীর কোনো ধর্মীয় পুস্তকে প্রথম দিবসটিকে পালনের কোনো নির্দেশনা নেই। এই হুল্লোড়, বেলেল্লাপনা, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা এগুলি যদি বৎসরের ১ম দিনটিতে এজন্যই করা হয় যে বৎসরের অবশিষ্ট দিনসমূহে এমন আনন্দ (যা মূলত নিরানন্দ, কেননা এর কুফলের শিকার তারা ও সমাজ) অব্যাহত থাকে তাহলে তাদের মানসিকতা বুঝতে অসুবিধা হয়না। আল্লাহ্ আমাদের এমন অপসংস্কৃতি হতে হিফাযাতে রাখুন — আমীন।

২। প্রশ্ন ঃ বিভিন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ্ যেমন আসাদুল্লাহ ‌গালিব, মুযাফ্ফর বিন মুহসিন, আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফ ও জাহাঙ্গীর আলাম ইসলাহী প্রমুখ তাঁদের গ্রন্থসমূহে মাইকে মৃত্যু সংবাদ প্রচারের বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। অপরদিকে আমাদের দেশের অধিকাংশ মাসজিদের তা করে চলেছেন। এ বিষয়ে আপনার পরামর্শ কি তা স্পষ্ট করবেন বলে আশা রাখি। — কাবীরুল ইসলাম, সূতি, মুর্শিদাবাদ।

উত্তর ঃ উল্লেখিত আলেমগণ নিজেদের গ্রন্থসমূহে এ বিষয়ে যা লিখেছেন, সঠিকটাই লিখেছেন (আল্লাহ্ তাঁদের ইল্ম ও আমালে বরকত দান করুন ও তাঁদেরকে সুরক্ষিত রাখুন — আমীন)।

বস্তুতঃ উঁচু স্থান হতে উচ্চ স্বরে মৃত্যু সংবাদ প্রচার ছিল মাক্কা ও তার পার্শ্বস্থ মুশরিকদের আচরণ। এ জন্যই তা হারাম। হুযাইফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'আমি যখন মারা যাব তখন তোমরা কাউকে তা জানাবে না। আমার সেটা ওই মৃত্যু সংবাহ হবে যা ঘোষণা করার বিষয়ে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে নিষেধ করতে শুনেছি' (আহ্কামুল জানায়িয্ ১ম খণ্ড, ৯ পৃষ্ঠা লিল্ আলবানী, সহীহ্ তারগী-ব ৩৫৩১)।

তিনি যেটা আশংকা করেছিলেন তাহল জাহেলী যুগের মৃতু প্রচার। তার ধারণা ছিল, লোক প্রেরণ করে গ্রামে গ্রামে প্রচার এবং উঁচু স্থানে আরোহন পূর্বক উচ্চ স্বরে নাম ও তার গুণ বর্ণনাসহ প্রচার। যেগুলির কোনটার সাথে মিল হলে তা বৈধ নয়। তবে উপস্থিত সাথী সঙ্গী মসজিদে মুসল্লীবৃন্দের সামনে আলোচনা তার অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) নাজ্জাশী বাদশাহ্‌র মৃত্যু সংবাদ সাথীদেরকে জানিয়েছিলেন (সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত ১৬৫২)। উল্লেখ্য কোনো বিশেষ ব্যক্তি ও আত্মীয়কেও টেলিফোন বার্তাও জাহেলী প্রথার অন্তর্ভুক্ত নয়।

৩। প্রশ্ন ঃ পিতা হারাম উপার্জনে যুক্ত। নিষেধ করা সত্বেও তা পরিত্যাগ না করলে কতদিন পর্যন্ত ছেলে তাঁর অধীনে থাকবে ও বর্তমান পরিস্থিতিতে কোন ধরণের নারীকে বিবাহ করা যাবে ? — নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, পাঠরত ছাত্র, আজাদ মিশন, জিবন্তী, মুর্শিদাবাদ।

উত্তর ঃ পিতার উপার্জন হারাম হলে সন্তান সাবালক ও উপার্জনে সক্ষম হলে তা ভক্ষণ করা হতে বিরত থাকবে। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, তিন ব্যক্তির (বিরুদ্ধে কিছু লিখা হতে) কলম উঠিয়ে রাখা হয়। (ক) ঘুমন্ত ব্যক্তি (যে প্রকৃতই ঘুমিয়ে আছে) যতক্ষণ না তার ঘুম ভাঙে (সুনানুল নাসায়ী ৩৪২২, হাদীস সহীহ্)। তবে এমন পিতা ও মাতার সাথে পৃথিবীতে সৎ ব্যবহার অব্যাহত রাখতে হবে (সূরাহ্ লুকমান ২৩৫)। (খ) শিশু যতক্ষণ না সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়, (গ) পাগল, যতক্ষণ না তার পাগলামী দূর হয়।

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''প্রকৃত ঈমানদার পৃথিবীতে সবচাইতে বেশি যেটা হতে লাভবান হয় তাহলে নেক স্ত্রী। সে এমন হবে যে স্বামী তার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই তাকে চার চাহনী দ্বারা সন্তুষ্ট করবে, আদেশ করলে তা পালন করবে। যদি (স্বামী) শপথ করে তা পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধরবে, আর স্বামী অনুপস্থিত হলে নিজের শরীর ও স্বামীর সম্পদের সুরক্ষা প্রদান করবে'' (সিলসিলাহ্ সহীহাহ্, হাসান ১৮৩৮)।

৪। প্রশ্ন ঃ টেষ্ট টিউব বেবী নেওয়া উচিৎ কি? — আবূ হেনা, জীবন্তি, মুর্শিদাবাদ

উত্তর ঃ— ল্যাপারোস্কোপিক পদ্ধতিতে বিশেষজ্ঞের দ্বারা অত্যন্ত সন্তর্পণে স্ত্রীর ডিম্বাণুকে বের করে আনা হয়। তারপর সেটিকে সংরক্ষণ করা হয়। অতঃপর স্বামী শুক্রাণু সমূহের মধ্য হতে সজীব ও ক্রিয়াশীল শুক্রাণুকে নিষিক্তকরণের লক্ষ্যে ছেড়ে দেওয়া হয় ডিম্বাণুর পেট্রিডিশে। ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর এই পেট্রিডিশটিকে সংরক্ষণ করা হয় মাতৃগর্ভের অনুরূপ পরিবেশের একটি ইনকিউবিটরে। ইনকিউবিটরের মধ্যে ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার পর্যবেক্ষণের পরই বোঝা যায় নিষিক্তকরণের পর ভ্রূণ সৃষ্টির সফলতা প্রসঙ্গে। ভ্রূণ সৃষ্টির পর সেটিকে একটি বিশেষ নলের মাধ্যমে তা স্ত্রী জরায়ুতে স্থানান্তর করা হয়। অতঃপর তা স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে নির্দ্ধারিত সময় অন্যান্য স্বাভাবিক প্রসবের মতই টেষ্টটিউব বেবি বা শিশুটিও পৃথিবীর রূপ দেখতে সক্ষমতা লাভ করে।

একমাত্র প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া দ্বারা সন্তান লাভে অক্ষম ব্যক্তিগণই এমন পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকেন। তবে রুচিশীলতার অভাবে কোনো বড় ব্যক্তির শুক্রাণু ক্রয় অথবা অনুদানরূপে গ্রহণ করেও টেষ্টটিউব বেবী লাভের চেষ্টাও বর্তমানে অব্যাহত।

এ বিষয়ে মতান্তর থাকলেও শুধুমাত্র একটিই পদ্ধতিই জায়েয। আর তা স্বামী-স্ত্রীর শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মাধ্যমেই হতে হবে, আর তা প্রতিস্থাপিত হতে হবে স্ত্রীর গর্ভেই। অন্যের গর্ভ ভাড়া করে অথবা বিনামূল্যে পরিষেবা নিয়ে তা করা যাবে না। একাধিক স্ত্রী থাকলে যার ডিম্বাণু নেওয়া হবে তা তারই গর্ভে পুনরায় প্রতিস্থাপিত হতে হবে। নতুবা ইসলামে যে বংশের ক্রমধারা নির্ধারিত আছে তা লংঘিত হবে, বিধায় তা হারাম (বিস্তারিত তথ্য ঃ কারারাতুল মাজমাঈল ফিক্হী ১৫৯-১৬১ পৃঃ)।

৫। প্রশ্ন ঃ আমি একজন পেশায় চিকিৎসক, আমার কোনো ফী নেই। ঔষধ বিক্রয়ের মাধ্যমে উপার্জন করতে হয়। যে ঔষধ সমূহে লাভ বেশি সেগুলি বেশি ব্যবহার করে থাকি। যদি ঔষধে কাজ হয়, তাহলে তা ব্যবহারে আপত্তি আছে কি? উত্তর দানে বাধিত করবেন। — ডাঃ কাবীরুল ইসলাম, সূতী, মুর্শিদাবাদ।

উত্তর ঃ আপনার বর্ণনা অনুযায়ী কম লাভ ও বেশি লাভের ঔষধ যদি সমভাবে কাজ করে তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। আর যদি রেজিষ্ট্রাড কোম্পানী ও নন রেজিষ্ট্রাডের ঔষধের মানে গুণগত পার্থক্য থাকে, তাহলে এটা এক প্রকার রুগীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা। দামও বেশি এবং মানেও কম। শুধুমাত্র লভ্যাংশের কম ও বেশির জন্য অসুবিধার কিছু দেখছি না। কেননা ক্রেতা ও বিক্রেতা উপস্থিত পণ্যের কোনো মূল্যের উপর সহমত হলেই ব্যবসা বৈধ (সূরা নিসা/২৯)।

এরপরেও যদি আভ্যন্তরীণ কোনো বিষয় থেকে থাকে যার কারণে আপনার মনে শংকার সৃষ্টি হচ্ছে, তাহলে সতর্কতা অবলম্বন উত্তম। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, 'যা তোমাকে সন্দেহে ফেলে তা ত্যাগ করে সন্দেহ মুক্তকে অবলম্বন করো' (তিরমিযী ২৫১৮)।

তাছাড়া অসহায় মানুষদের দিকে চেয়ে দামে ও লাভে কম অথচ গুণগতমান ভাল এমন ঔষধ ব্যবহার করা উত্তম। কেননা উপকারের বিনিময় (আল্লাহ্র নিকট হতে) উপকার হিসাবে আসে (সূরাতুর রহমান ৬০)। ইন্শাআল্লাহ্ তাতেই বরকত হবে।

৬। প্রশ্ন ঃ শিক্ষা অর্জন অথবা কর্মক্ষেত্রে কি প্রতিদিন সময়ে স্বলাতকে ছেড়ে দিয়ে অন্য সময় কাযা করা যাবে? — আব্দুর রহমান, বহরমপুর।

উত্তর ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন, নিশ্চয় স্বলাহ্ বিশ্বাসীগণের উপর নির্ধারিত সময়ে পড়া আবশ্যিক (সূরাহ্ নিসা, ১০৩)। যা বাধা দান করে তা হতে বিরত থাকো (সূরাতুল মায়েদাহ্, ৯১)।

সুতরাং এমন কাজে নিজেকে যুক্ত করা মুমিনের জন্য বাঞ্ছনীয় নয় যা তার ঈমান ও আমলের জন্য হানিকর হবে। ঘটনাক্রমে কখনও কখনও যদি এমন অবস্থা ঘটে তাহলে সেটা চলতে পারে। কিন্তু জেনে বুঝে নিয়মিত এমন করাটা অপরাধ। আল্লাহ্ আমাদের রক্ষা করুন।

আল্লাহ্ বলেন পরবর্তীতে এমন খারাপ লোকেদের আগমন ঘটেছে যারা স্বলাহকে বিনষ্ট করেও প্রবৃত্তির অনুসারী, তারা সত্বর গায়' (নামক জাহান্নামে) প্রবেশ করবে (সূরা মারয়াম, ৫৯)।

আসামের সাংসদ বদরুদ্দীন আজমাল সাহেব অধিবেশন চলাকালীন সালাফীদের বিরুদ্ধে যে অপবাদমূলক কথা বলেছেন তার জন্য তিনি ক্ষমা চেয়ে ও দুঃখ প্রকাশ করে নিচের পত্রটি লেখেন —

Maulana Badruddin Ajmal
Member of Parliament
(Lok Sabha)
Dhubri, Assam

Delhi Residence & Correspondence Address
1-3, South Avenue
New Delhi-110011



PRESIDENT:
All India United Democratic Front

Tel./Fax : 011-23795363
Mobile : +919013180448
E-mail : mpdhubri@gmail.com
b.ajmal@sansad.nic.in

معذرت

کل (27 دسمبر 2018) کو پارلیمنٹ میں طلاق سے متعلق بل پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے میں نے سبقت لسانی میں اپنے سلفی بھائیوں سے متعلق ایک غلط اور بے اصل بات کہہ دی تھی جس کا مجھے بے حد افسوس ہے۔ میری نیت بالکل بھی وہ نہیں تھی جو بات غلطی سے زبان سے ادا ہوئی۔ میرا سلفی بھائیوں کے متعلق یہ موقف بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ "دہشت گردی کی حمایت کرتے ہیں یا وہ دہشت گردی میں ملوث ہیں" اسلئے میں اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے پارلیمنٹ میں دیئے گئے بیان سے معذرت کے ساتھ رجوع کرتا ہوں۔ اللہ سے دعاء کرتا ہوں کہ وہ ہماری کمیوں کو دور کرے۔ پارلیمنٹ کے ضابطہ کے مطابق میں نے اپنی تقریر کے اس حصہ کو پارلیمنٹ کے ریکارڈ سے ہٹانے کی بھی درخواست دے دی ہے جس کے بعد انشاء اللہ وہاں سے بھی وہ حصہ ہٹ جائیگا۔

دعاء کا طالب

[مولانا] بدرالدین اجمل
رکن پارلیمنٹ و صدر اے آئی یو ڈی ایف

M. BADRUDDIN AJMAL
Member of Parliament
Lok Sabha
Dhubri, Assam

আসাম রাজ্যের ধুবড়ি জেলার সাংসদ এবং অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ডেমক্রেটিভ ফ্রন্ট সভাপতি বদরুদ্দীন আজমাল গত ২৭.১২.২০১৮ সাংসদে তিন তালাক বিলের উপর বলতে গিয়ে আহ্‌লে হাদীসের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের গোপন করে রাখা শত্রুতাকে প্রকাশ করে ফেলেন। কেননা আহ্‌লে হাদীস তথা সালাফীগণ অ্যাট এ টাইমের তিন তালাককে সহীহ্ হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী এক তালাক ধরে থাকেন। বদরুদ্দীন আজমাল সাহেব এক মজলিসের তিন তালাককে তিনরূপেই গণ্য করেন। তাই বিদ্বেষবশতঃ বলে ফেলেন যে ‘‘সালাফীরা তো সন্ত্রাসী। ভারতে যত সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটেছে তা সকলেই জানে এবং সরকারও জানে যে সেগুলির সাথে সালাফীরা-ই যুক্ত আছে। এজন্যই ভারত সরকার তাদের নিষিদ্ধ করেছে।’’

স্বাধীনতা সংগ্রামে আহ্‌লে হাদীসগণই ছিলেন নায়কের ভূমিকায় এবং তাঁরাই খুন হয়েছেন সব চাইতে বেশি। ইতিহাসের পাতায় পাতায় তা লিখা আছে। বদরুদ্দীন আজমাল সাহেবের উক্ত অপবাদের বিরুদ্ধে শান্তিকামী ও সৎ মানুষের পক্ষ হতে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। তারই প্রেক্ষিতে তিনি ক্ষমা চেয়ে এই পত্রটি লেখেন। কিন্তু যেখানে তিনি ভুল বলেছেন সেখানেই তাঁকে ক্ষমা চাইতে হবে। কেননা সমস্ত মিডিয়া খবরটিকে কভার করেছে। তার সংশোধন একমাত্র সাংসদেই হতে হবে।

তাছাড়া সারা পৃথিবীর সমস্ত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ সালাফীরাই লেখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি করেছেন। মিথ্যা অপবাদ দাতাদের উপর আল্লাহ্‌র ক্রোধ নেমে আসুক।

সংগঠন সংবাদ

গত ৯.১২.১৮ রোজ রবিবার বহরমপুর গোরাবাজার আহ্‌লে হাদীস জামে মাসজিদে জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীস, মুর্শিদাবাদের পক্ষ হতে একটি মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় দারসে কুরআনে জেলা আমীর শায়খ আব্দুল্লাহ্ সালাফী সাহেব সূরাহ্ রা'আদ-এর ৮-১৩ নং আয়াত তেলাওত করেন এবং তার ভাবার্থ ও মর্মার্থ বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক নারীর গর্ভে ছেলে না মেয়ে, সুশ্রী না কুশ্রী, সুজন না কুজন, দীর্ঘায়ু না অল্পায়ু তা সবই জানেন। তাছাড়া জরায়ুতে যা কিছু কমে ও বাড়ে অর্থাৎ ১০ মাস না আটমাস, না সাত মাস এসবই মহান আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো কারো জানা নেই। দৃশ্যমান অদৃশ্যমান সম্বন্ধে তিনিই সুমহান অবগত। মানুষেরা যে গোপনে কথা বলে অথবা প্রকাশ্যে বলে তার সমস্ত জ্ঞানই আল্লাহ্‌র কাছে। মানুষের জন্য তার সামনে ও পেছনে একের পর এক প্রহরী থাকে ওরা আল্লাহ্‌র আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে অর্থাৎ ফেরেশতাবর্গ যারা পালাক্রমে একে অপরের পরে আসতে থাকেন। দিনের ফেরেশতা গেলে রাতের ফেরেশতা আসেন এবং রাতের ফেরেশতা গেলে দিনের ফেরেশতা আসেন। দিনের বেলায় এই ফেরেশতার পরিবর্তন ঘটে আসর স্বলাতের সময়। তাই আসর স্বলাতের গুরুত্ব সর্বাধিক। নিশ্চয় আল্লাহ্ কোনো সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে। অর্থাৎ যতক্ষণ না পর্যন্ত কোনো জাতি বা গোষ্ঠী নিয়ামত অস্বীকারের পথ অবলম্বন করে এবং আল্লাহ্ তাআলার আদেশ ও নিষেধ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজেদের অবস্থা আচরণকে বদলে না নেবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তাআলা তাদের উপর নিজ নিয়ামতের দরজা বন্ধ করে দেন না। তাই প্রতিটি মানুষ আল্লাহ্‌র আনুগত্যের পথ অবলম্বন করুক। আর কোনো সম্প্রদায় সম্পর্কে যদি আল্লাহ্ অশুভ কিছু ইচ্ছা করেন তাহলে তা রদ করবার কেউ নেই এবং তিনি ছাড়া তাদের কোনো অভিভাবক নেই। প্রত্যেক বস্তুই আল্লাহ্‌র প্রশংসা বর্ণনা করে। তিনি বজ্রসমূহ প্রেরণ করেন এবং যাকে ইচ্ছা তাকে এর মাধ্যমে ধ্বংসও করে দেন। উপরের আলোচনা থেকে দুটি বিষয় সুস্পষ্ট। প্রথমতঃ মনের মধ্যে বক্রতা রাখা যাবে না। মানসিক উদারতা প্রদর্শনই মুক্তির অন্যতম সোপান। দ্বিতীয়তঃ অন্যের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন। সুসম্পর্কই মানুষের দীর্ঘায়ুর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ। শুধু তাই নয় সুসম্পর্ক রুযী বৃদ্ধির অন্যতম বিষয়। অতএব আসুন আমরা আল্লাহ্‌র কাছে দুআ করি আল্লাহ্ যেন আমাদের সকলকে মনের বিশুদ্ধতা ও পরিশুদ্ধতা প্রদান করেন এবং আমাদের সকলের সমনের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে প্রশস্ততা দান করে — আমীন।

অদ্যকার সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ ঃ—

১। ১৩ই ডিসেম্বর' ১৮ বৃহস্পতিবার জলঙ্গি ব্লকের পুনর্গঠনের লক্ষ্যে কাজ সম্পন্ন হবে ইন্‌শাআল্লাহ্। পর্যবেক্ষক হিসাবে উপস্থিত থাকবেন ইমাম হোসেন ও মোঃ কুতুবুদ্দীন।

২। মুর্শিদাবাদ জেলায় শরীয়তের কোনো বিষয়ে মতভেদ বা বিতর্ক দেখা দিলে তা নিরসনের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগতভাবে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ না করে মুর্শিদাবাদ জেলা নেতৃত্ব কর্তৃক লিখিত শর্তাবলী ছাড়া এমন কোনো বিতর্ক বা মোনাযেরায় অংশ গ্রহণ করা থেকে মুক্ত থাকতে হবে। লিখিত শর্তাবলী খুব দ্রুত প্রকাশিত হবে।

৩। প্রতিষ্ঠিত কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জমঈয়তের কোনো সদস্য কোনোভাবে যুক্ত থাকতে পারবেনা।

৪। ফারাক্কা ব্লক জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীস কর্তৃক আয়োজিত ও জেলা জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীস, মুর্শিদাবাদ কর্তৃক সমাদৃত বিশেষ এক চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে ২৯ ও ৩০শে ডিসেম্বর শনিবার ও রবিবার সরল পথ অ্যাকাডেমি (বয়েজ) এর মসজিদে, প্রায় ৮০০ জন সক্রিয় কর্মীদের উপস্থিতির মাধ্যমে।

আর কোনো আলোচনা না থাকায় দুআ পাঠের মাধ্যমে সভার পরিসমাপ্তি ঘটে। ইতি —

জেলা সম্পাদক

---

৪২ পাতার পর —

১৪। প্রশ্ন ঃ ইসলামের ইতিহাসে প্রথম দাঈ কে?

উঃ— মুসআব বিন উমায়ের বিন হাশেম

১৫। প্রশ্ন ঃ মুসআব বিন উমায়ের বিন হাশেমকে দাঈ হিসাবে পাঠানোর কারণ কী ছিল?

উঃ— তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণধী এবং অত্যন্ত বিশ্বস্ত যুবক। বিষয়বস্তু উপস্থাপন ও অন্যকে আকৃষ্ট করার অনন্য সাধারণ গুণাবলী তার মধ্যে ছিল।

১৬। প্রশ্ন ঃ কার নেতৃত্বে মদীনায় সর্বপ্রথম ইসলাম প্রচারিত হয়?

উঃ— আসআদ বিন যুরারাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) র নেতৃত্বে।

বহরমপুর কেন্দ্রিক স্থায়ী সময় সারণী (১৬ই জানু-১৫ই ফেব্রুয়ারী)

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	যুহুর	আসর	মাগরিব	ইশা
১৬ জানুঃ	৫:০৩	৬:২২	১১:৪৭	২:৫১	৫:১১	৬:৩১
১৭	৫:০৩	৬:২২	১১:৪৭	২:৫১	৫:১২	৬:৩২
১৮	৫:০৩	৬:২২	১১:৪৮	২:৫২	৫:১৩	৬:৩২
১৯	৫:০৩	৬:২২	১১:৪৮	২:৫৩	৫:১৪	৬:৩৩
২০	৫:০৩	৬:২১	১১:৪৮	২:৫৩	৫:১৪	৬:৩৪
২১	৫:০৩	৬:২১	১১:৪৯	২:৫৪	৫:১৫	৬:৩৪
২২	৫:০৩	৬:২১	১১:৪৯	২:৫৪	৫:১৬	৬:৩৫
২৩	৫:০৩	৬:২১	১১:৪৯	২:৫৫	৫:১৬	৬:৩৫
২৪	৫:০৩	৬:২১	১১:৪৯	২:৫৬	৫:১৭	৬:৩৬
২৫	৫:০৩	৬:২০	১১:৫০	২:৫৬	৫:১৮	৬:৩৭
২৬	৫:০২	৬:২০	১১:৫০	২:৫৭	৫:১৯	৬:৩৭
২৭	৫:০২	৬:২০	১১:৫০	২:৫৮	৫:১৯	৬:৩৮
২৮	৫:০২	৬:২০	১১:৫০	২:৫৮	৫:২০	৬:৩৮
২৯	৫:০২	৬:১৯	১১:৫০	২:৫৯	৫:২১	৬:৩৯
৩০	৫:০২	৬:১৯	১১:৫১	২:৫৯	৫:২১	৬:৪০
৩১	৫:০১	৬:১৯	১১:৫১	৩:০০	৫:২২	৬:৪০
১লা ফেব্রুঃ	৫:০১	৬:১৮	১১:৫১	৩:০০	৫:২৩	৬:৪১
২	৫:০১	৬:১৮	১১:৫১	৩:০১	৫:২৪	৬:৪১
৩	৫:০০	৬:১৭	১১:৫১	৩:০১	৫:২৪	৬:৪২
৪	৫:০০	৬:১৭	১১:৫১	৩:০২	৫:২৫	৬:৪৩
৫	৫:০০	৬:১৬	১১:৫১	৩:০৩	৫:২৬	৬:৪৩
৬	৪:৫৯	৬:১৬	১১:৫১	৩:০৩	৫:২৬	৬:৪৪
৭	৪:৫৯	৬:১৫	১১:৫২	৩:০৩	৫:২৭	৬:৪৪
৮	৪:৫৮	৬:১৫	১১:৫২	৩:০৪	৫:২৮	৬:৪৫
৯	৪:৫৮	৬:১৪	১১:৫২	৩:০৪	৫:২৮	৬:৪৫
১০	৪:৫৭	৬:১৪	১১:৫২	৩:০৫	৫:২৯	৬:৪৬
১১	৪:৫৭	৬:১৩	১১:৫২	৩:০৫	৫:৩০	৬:৪৬
১২	৪:৫৬	৬:১২	১১:৫২	৩:০৬	৫:৩০	৬:৪৭
১৩	৪:৫৬	৬:১২	১১:৫২	৩:০৬	৫:৩১	৬:৪৮
১৪	৪:৫৫	৬:১১	১১:৫২	৩:০৬	৫:৩১	৬:৪৮
১৫	৪:৫৫	৬:১১	১১:৫২	৩:০৭	৫:৩২	৬:৪৯